ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী প্রবর্তন ও প্রবর্তক: একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা

[Bengali – বাংলা – بنغالي]

প্রফেসর ড. খন্দকার আ.ন.ম আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর

সম্পাদনা

প্রফেসর ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

مبادرة رعاية المجتمع، تونغي، غازيبور
Community Welfare Initiative, Tongi, Gazipur-1700
Mobile : +88 01575 547999, Email : info@cwibd.com

عيد ميلاد النبي، التأسيس والمؤسس: دراسة تأريخية

(باللغة البنغالية)

الأستاذ الدكتور خوندكار أبو نصر محمد عبد الله جهانغير

مراجعة

الأستاذ د/ أبو بكر محمد زكريا

مبادرة رعاية المجتمع، تونغي، غازيبور
Community Welfare Initiative, Tongi, Gazipur-1700
Mobile : +88 01575 547999, Email : info@cwibd.com

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা............

ঈদে মীলাদুন্নবী" মুসলিম বিশ্বের বহু স্থানে পালনকৃত একটি উৎসব, যা রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখে নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্ম স্মরণে উদযাপিত হয়। তবে ইতিহাসে প্রথম যুগে সাহাবী, তাবেয়ী কিংবা তাবে-তাবেয়ীদের মধ্যে এ উদযাপনের কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না।

মীলাদ উদযাপনের সূচনা ঘটে মূলত শিয়া ফাতেমী শাসকদের আমলে মিশরে (চতুর্থ হিজরী শতকে)। তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মদিনসহ আলী, ফাতিমা, হাসান ও হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমার জন্মদিন রাষ্ট্রীয়ভাবে পালন করতো। পরবর্তীতে হিজরী ষষ্ঠ শতকের শেষ দিকে ইরাকের ইরবিলের শাসক আবু সাঈদ কুকবূরী সুন্নী সমাজে এ উৎসব প্রচলন করেন এবং ব্যাপক জনপ্রিয় করে তোলেন।

ঐতিহাসিকভাবে দেখা যায়, এই উদযাপন সামাজিক-রাজনৈতিক পটভূমির সাথে সম্পর্কিত ছিল। ইসলামী সাম্রাজ্যে ক্রুসেড ও তাতার আক্রমণ, অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা, এবং সাংস্কৃতিক অবক্ষয়ের প্রেক্ষাপটে নতুন নতুন প্রথা প্রচলিত হয়, তন্মধ্যে মীলাদ অন্যতম।

এ বইটিতে মীলাদের অর্থ, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মদিন সম্পর্কিত মতভেদ, ইসলামের প্রাথমিক যুগে মীলাদ না থাকার ঐতিহাসিক সাক্ষ্য, এবং পরবর্তী সময়ে এর প্রবর্তন ও প্রসারের বিস্তারিত ঐতিহাসিক পর্যালোচনা করা হয়েছে।

সূচিপত্র

ক্র	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
১	১. ঈদে মীলাদুন্নবী: পরিচিতি	
২	ক. ‘মীলাদ’ শব্দের অর্থ ও ব্যাখ্যা	
৩	খ. ‘মীলাদ’ বা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মদিন	
৪	হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মদিন	
৫	এক. জন্মবার	
৬	দুই. জন্মবৎসর	
৭	তিন. জন্মমাস ও জন্ম তারিখ	
৮	রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মদিন: আলেমগণ ও ঐতিহাসিকদের মতামত	
৯	২. মীলাদুন্নবী বা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মদিবস পালন বা উদযাপন	
১০	ক. পূর্বকথা	
১১	খ. ঈদে মীলাদুন্নবী উদযাপন: প্রাথমিক প্রবর্তন ও সীমিত উদযাপন	
১২	গ. ঈদে মীলাদুন্নবীর প্রাথমিক উদযাপন: যুগ ও প্রবর্তক পরিচিতি	
১৩	ঘ. ঈদে মীলাদুন্নবীর প্রাথমিক উদযাপন: অনুষ্ঠান পরিচিতি	
১৪	৩. ঈদে মীলাদুন্নবী উদযাপন: প্রকৃত প্রবর্তন ও ব্যাপক উদযাপন	
১৫	ক. যুগ পরিচিতি: হিজরী ষষ্ঠ ও সপ্তম শতক	
১৬	খ. প্রবর্তক: ব্যক্তি ও জীবন	
১৭	গ. প্রথম মীলাদ গ্রন্থ লেখক: ব্যক্তি ও জীবন	
১৮	উপসংহার	

পরম করুণাময় আল্লাহর নামে শুরু করছি। তাঁর জন্যই সকল প্রশংসা। সালাত ও সালাম মহান রাসূল, আল্লাহর হাবীব ও মানবতার মুক্তিদূত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাঁর পরিবারবর্গ ও সঙ্গীদের ওপর। আজকের বিশ্বে মুসলিম উম্মাহর অন্যতম উৎসবের দিন হচ্ছে 'ঈদে মীলাদুন্নবী'। সারা বিশ্বের বহু মুসলিম অত্যন্ত জাঁকজমক, ভক্তি ও মর্যাদার সাথে আরবী বৎসরের তৃতীয় মাস রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখে এই 'ঈদে মীলাদুন্নবী' বা নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মের ঈদ পালন করেন। কিন্তু অধিকাংশ মুসলিমই এই ঈদের উৎপত্তি ও বিকাশের ইতিহাসের সাথে পরিচিত নন। যে সকল ব্যক্তিত্ব এই উৎসব মুসলিম উম্মাহর মধ্যে প্রচলন করেছিলেন তাদের পরিচয়ও আমাদের অধিকাংশের অজানা রয়েছে। এই নিবন্ধে আমি উপরোক্ত বিষয়গুলো আলোচনার চেষ্টা করব।

১. ঈদে মীলাদুন্নবী: পরিচিতি

ক. 'মীলাদ' শব্দের অর্থ ও ব্যাখ্যা:

মীলাদ শব্দের আভিধানিক অর্থ: জন্মসময়। এই অর্থে 'মাওলিদ' শব্দটিও ব্যবহৃত হয়[১]। আল্লামা ইবন মানযূর তাঁর সুপ্রসিদ্ধ আরবী অভিধান 'লিসানুল আরবে' লিখছেন: "ميلاد الرجل: اسم الوقت الذي ولد فيه" অর্থাৎ: 'লোকটির মীলাদ: যে সময়ে সে জন্মগ্রহণ করেছে সে সময়ের নাম।'[২] স্বভাবতই মুসলিমগণ 'মীলাদ' বা 'মীলাদুন্নবী' বলতে শুধুমাত্র রাসূলুল্লাহ্

১. ড. ইবরাহীম আনীস ও সঙ্গীগণ, আল-মুজাম আল ওয়াসীত (বৈরুত: দারুল ফিকর) ২/১০৫৬।

২. ইবনে মনজুর, লিসানুল আরব (বৈরুত: দারু সাদের) ৩/৪৬৮।

সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মের সময়ের আলোচনা করা বা জন্ম কথা বলা বুঝান না। বরং তারা 'মীলাদুন্নবী' বলতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মের সময় বা জন্মদিনকে বিশেষ পদ্ধতিতে উদযাপন করাকেই বুঝান। আমরা এই আলোচনায় 'মীলাদ' বা 'ঈদে মীলাদুন্নবী' বলতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্ম উদযাপন বুঝাব। তাঁর জন্ম উপলক্ষে কোনো আনন্দ প্রকাশ, তা তাঁর জন্মদিনেই হোক বা জন্ম উপলক্ষে অন্য কোনো দিনেই হোক যেকোনো অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাঁর জন্ম পালন করাকে আমরা 'মীলাদ' বলে বুঝব। শুধুমাত্র তাঁর জীবনী পাঠ, বা জীবনী আলোচনা, তাঁর বাণী, তাঁর শরীয়ত বা তাঁর হাদীস আলোচনা, তাঁর আকৃতি বা প্রকৃতি আলোচনা করা মূলতঃ মুসলিম সমাজে মীলাদ বলে গণ্য নয়। বরং জন্ম উদযাপন বা পালন বা জন্ম উপলক্ষে কিছু অনুষ্ঠান করাই মীলাদ বা ঈদে মীলাদুন্নবী হিসেবে মুসলিম সমাজে বিশেষভাবে পরিচিত।

খ. 'মীলাদ' বা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মদিন:

মীলাদ অনুষ্ঠান যেহেতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মদিন পালন কেন্দ্রিক, তাই প্রথমেই আমরা তাঁর জন্মদিন সম্পর্কে জানতে চেষ্টা করব। স্বভাবতঃই আমরা যেকোনো ইসলামী আলোচনা কুরআনুল কারীম ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসের আলোকে শুরু করি। কুরআনুল কারীমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের 'মীলাদ' অর্থাৎ তাঁর জন্ম, জন্ম সময় বা জন্ম উদযাপন বা পালন সম্পর্কে কিছুই বলা হয়নি। কুরআন করীমে পূর্ববর্তী কোনো কোনো নবীর জন্মের ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে, তবে কোথাও কোনোভাবে কোনো দিন, তারিখ, মাস উল্লেখ করা হয়নি। অনুরূপভাবে 'মীলাদ' পালন করতে, অর্থাৎ কারো জন্ম উদযাপন করতে বা জন্ম উপলক্ষে আলোচনার মাজলিস

করতে বা জন্ম উপলক্ষে আনন্দ প্রকাশের কোনো নির্দেশ, উৎসাহ বা প্রেরণা দেওয়া হয়নি। শুধুমাত্র আল্লাহর মহিমা বর্ণনা ও শিক্ষা গ্রহণের জন্যই এসকল ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। ঐতিহাসিক তথ্যাদি আলোচনার মাধ্যমে এর আত্মিক প্রেরণার ধারাবাহিকতা ব্যহত করা হয়নি। এজন্য আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মদিন সম্পর্কে আলোচনায় মূলত হাদীস ও পরবর্তী যুগের মুসলিম ঐতিহাসিক ও আলেমগণের মতামতের ওপর নির্ভর করব:

হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মদিন:

হাদীস বলতে আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা, কর্ম, অনুমোদন বা তাঁর সম্পর্কে কোনো বর্ণনা বুঝে থাকি। এছাড়াও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহাবীগণের কথা, কর্ম বা অনুমোদনকেও হাদীস বলা হয়ে থাকে।[৩] হিজরী দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতাব্দীতে প্রায় অর্ধশতাধিক গ্রন্থে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস ও তাঁর সাহাবীগণের মতামত সনদ বা বর্ণনাসূত্রসহ সংকলিত হয়। তন্মধ্যে 'আল-কুতুবুস সিত্তাহ' নামে প্রসিদ্ধ ৬টি অতি প্রচলিত ও নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ সকল হাদীসগ্রন্থের সংকলিত হাদীস থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মবার, জন্মদিন ও জন্মতারিখ সম্বন্ধে প্রাপ্ত তথ্য নিম্নরূপ:

এক. জন্মবার

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মবার সম্পর্কে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

---

৩. আব্দুল হাই লাখনাবী, যাফরুল আমানী ফী মুখতাসারিল জুরজানী (সংযুক্ত আরব আমিরাত, দুবাই: দারুল ইলম, ১ম সংস্করণ, ১৯৯৫ খ্রি.), পৃ. ৩১-৩৪।

আবু কাতাদা আল-আনসারী রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ عَنْ صَوْمِ الاثْنَيْنِ فَقَالَ: «ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ وَيَوْمٌ بُعِثْتُ أَوْ أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ»

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সোমবার দিন সিয়াম রাখা সম্পর্কে জিজ্ঞেসা করা হলে তিনি বলেন, 'এই দিনে (সোমবারে) আমি জন্মগ্রহণ করেছি এবং এই দিনেই আমি নবুওয়াত লাভ করেছি'।"[৪]

ইমাম আহমদ তার মুসনাদে সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন:

ইবন আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন,

«وُلِدَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ الاثْنَيْنِ وَاسْتُنْبِئَ يَوْمَ الاثْنَيْنِ وَتُوُفِّيَ يَوْمَ الاثْنَيْنِ وَخَرَجَ مُهَاجِرًا مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ يَوْمَ الاثْنَيْنِ وَقَدِمَ الْمَدِينَةَ يَوْمَ الاثْنَيْنِ وَرَفَعَ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ يَوْمَ الاثْنَيْنِ»

"নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সোমবারে জন্মগ্রহণ করেন, সোমবারে নবুওয়াত লাভ করেন, সোমবারে মারা যান, সোমবারে মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনার পথে রওয়ানা করেন, সোমবারে মদীনা পৌঁছেন এবং সোমবারেই তিনি হাজারে আসওয়াদ উত্তোলন করেন।"[৫]

এভাবে আমরা হাদীস থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মবার জানতে পারি। সহীহ হাদীসের আলোকে প্রায় সকল ঐতিহাসিক

৪. সহীহ মুসলিম (মিশর, কাইরো: দারু এহইয়াইল কুতুবিল আরাবিয়্যাহ, তারিখ বিহীন) ২/৮১৯।

৫. আহমাদ ইবন হাম্বল, আল-মুসনাদ (মিসর: দারুল মা'আরিফ, ১৯৫০) ৪/১৭২-১৭৩, নং ২৫০৬। (সম্পাদক আহমদ শাকির সনদ আলোচনা করে বলেছেন: হাদীসটির সনদ সহীহ)

একমত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সোমবার জন্মগ্রহণ করেন।

দুই. জন্মবৎসর

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মবৎসর বা জন্মের সাল সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে:

কায়স ইবন মাখরামা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন,

وُلِدْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ ﷺ عَامَ الْفِيلِ. وَسَأَلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ قُبَاثَ بْنَ أَشْيَمَ أَخَا بَنِي يَعْمَرَ بْنِ لَيْثٍ أَأَنْتَ أَكْبَرُ أَمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَكْبَرُ مِنِّي وَأَنَا أَقْدَمُ مِنْهُ فِي الْمِيلادِ وُلِدَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَامَ الْفِيلِ.

আমি ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'জনেই হাতীর বছরে জন্মগ্রহণ করেছি। উসমান ইবন আফফান রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু কুবাস ইবন আশইয়ামকে প্রশ্ন করেন: আপনি বড়, নাকি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বড়? তিনি উত্তরে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার থেকে বড়, আর আমি তাঁর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাতীর বছরে জন্মগ্রহণ করেন।"[৬]

---

৬. তিরমিযী, আল-জামিউস সহীহ, প্রাগুক্ত (৫/৫৫০), নং ৩৬১৯। ইমাম তিরমিযী বলেছেন: হাদীসটি হাসান গরীব।

হাতীর বছর অর্থাৎ যে বৎসর আবরাহা হাতী নিয়ে কাবা ঘর ধ্বংসের জন্য মক্কা আক্রমণ করেছিল। ঐতিহাসিকদের মতে এ বছর ৫৭০ বা ৫৭১ খ্রিস্টাব্দ ছিল।[৭]

তিন. জন্মমাস ও জন্ম তারিখ

এভাবে আমরা হাদীসের আলোকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মবৎসর ও জন্মবার সম্পর্কে জানতে পারি। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো হাদীসে তাঁর জন্মমাস ও জন্ম তারিখ সম্পর্কে কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। এ কারণে পরবর্তী যুগের আলেম ও ঐতিহাসিকগণ তাঁর জন্ম তারিখ সম্পর্কে অনেক মতভেদ করেছেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মদিন: আলেমগণ ও ঐতিহাসিকদের মতামত:

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্ম তারিখ সম্পর্কে যেহেতু হাদীসে রাসূলের হাদীসে কোনো বর্ণনা আসেনি এবং সাহাবীগণের মাঝেও এ বিষয়ে কোনো সুনির্দিষ্ট মত প্রচলিত ছিল না, তাই মুসলিম ঐতিহাসিকগণ এ বিষয়ে বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন। ইবন হিশাম, ইবন সা'দ, ইবন কাসীর, কাসতাল্লানী ও অন্যান্য ঐতিহাসিক ও সীরাতুন্নবী লিখকগণ এ বিষয়ে নিম্নলিখিত মতামত উল্লেখ করেছেন:

---

৭. আকরাম যিয়া আর-উমারী, আস-সীরাতুন নাবাবীয়্যাহ আস-সহীহা (মদীনা মুনাওয়ারা: মাকতাবাতুল উলুম ওয়াল হিকাম, ৪র্থ সংস্করণ ১৯৯৩) ১/৯৬-৯৮, মাহদী রেজকুল্লাহ আহমদ, আস-সীরাতুন নাবাবীয়াহ (সৌদি আরব, রিয়াদ: বাদশাহ ফয়সাল কেন্দ্র, ১ম সংস্করণ, ১৯৯২), পৃ. ১০৯-১১০।

১. কারো মতে, তাঁর জন্ম তারিখ অজ্ঞাত, তা জানা যায়নি, এবং তা জানা সম্ভব নয়। তিনি সোমবারে জন্মগ্রহণ করেছেন এটুকুই শুধু জানা যায়, জন্মমাস বা তারিখ জানা যায় না। এ বিষয়ে কোন আলোচনা তারা অবান্তর মনে করেন।

২. কারো কারো মতে, তিনি মুহাররম মাসে জন্মগ্রহণ করেছেন।

৩. অন্য মতে, তিনি সফর মাসে জন্মগ্রহণ করেছেন।

৪. কারো মতে, তিনি রবিউল আউয়াল মাসের ২ তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। দ্বিতীয় হিজরী শতকের অন্যতম ঐতিহাসিক ও মাগাযী প্রণেতা মুহাদ্দিস আবু মা'শার নাজীহ ইবন আব্দুর রহমান আস-সিনদী (১৭০ হি.) এই মতটি গ্রহণ করেছেন।

৫. অন্য মতে, তাঁর জন্ম তারিখ রবিউল আউয়াল মাসের ৮ তারিখ। আল্লামা কাসতাল্লানী ও যারকানীর বর্ণনায় এই মতটিই অধিকাংশ মুহাদ্দিস গ্রহণ করেছেন। এই মতটি দুইজন সাহাবী ইবন আব্বাস ও জুবাইর ইবন মুত'য়িম রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে বর্ণিত। অধিকাংশ ঐতিহাসিক ও সীরাতুন্নবী বিশেষজ্ঞ এই মতটি গ্রহণ করেছেন বলে তারা উল্লেখ করেছেন। প্রখ্যাত তাবেয়ী ইমাম মুহাম্মাদ ইবন মুসলিম ইবন শিহাব আয-যুহরী (১২৫ হি.) তার উস্তাদ প্রথম শতাব্দীর প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ও নসববিদ ঐতিহাসিক তাবেয়ী মুহাম্মাদ ইবন জুবাইর ইবন মুত'য়িম (১০০ হি.) থেকে এই মতটি বর্ণনা করেছেন। কাসতালানী বলেন, মুহাম্মাদ ইবন জুবাইর আরবদের বংশ পরিচিতি ও আরবদের ইতিহাস সম্পর্কে অভিজ্ঞ ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্ম তারিখ সম্পর্কিত এই মতটি তিনি তাঁর পিতা সাহাবী জুবাইর ইবন মুত'য়িম থেকে গ্রহণ করেছেন। স্পেনের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ও ফকিহ আলী ইবন আহমদ ইবন হাযম (৪৫৬ হি.) ও মুহাম্মাদ ইবন ফাতুহ আল-হুমাইদী (৪৮৮ হি.) এই মতটিকে

গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেছেন। স্পেনের মুহাদ্দিস আল্লামা ইউসূফ ইবন আব্দুল্লাহ ইবন আব্দুল বার (৪৬৩ হি.) উল্লেখ করেছেন যে, ঐতিহাসিকগণ এই মতটিই সঠিক বলে মনে করেন। মীলাদের ওপর প্রথম গ্রন্থ রচনাকারী আল্লামা আবুল খাত্তাব ইবন দেহিয়া (৬৩৩ হি.) ঈদে মীলাদুন্নবীর ওপর লিখিত 'আত-তানবীর ফী মাওলিদিল বাশির আন নাযীর' গ্রন্থে এই মতটিকেই গ্রহণ করেছেন।

৬. অন্য মতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্ম তারিখ ১০ রবিউল আউয়াল। এই মতটি ইমাম হুসাইনের পৌত্র মুহাম্মাদ ইবন আলী আল-বাকের (১১৪ হি.) থেকে বর্ণিত। দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আমির ইবন শারাহিল আশ-শা'বী (১০৪ হি.) থেকেও এই মতটি বর্ণিত। ঐতিহাসিক মুহাম্মাদ ইবন উমার আল-ওয়াকেদী (২০৭ হি.) এই মত গ্রহণ করেছেন। ইবন সা'দ তার বিখ্যাত 'আত-তাবাকাতুল কুবরা'য় শুধু দুইটি মত উল্লেখ করেছেন, ২ তারিখ ও ১০ তারিখ।[৮]

৭. কারো মতে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্ম তারিখ ১২ রবিউল আউয়াল। এই মতটি হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রখ্যাত ঐতিহাসিক মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক (১৫১ হি.) গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেছেন: 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাতীর বছরে রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখে জন্মগ্রহণ করেছেন।'[৯] এখানে লক্ষণীয় যে, ইবন ইসহাক সীরাতুন্নবীর সকল তথ্য সাধারণত সনদসহ

---

৮. ইবন সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা (বৈরুত: দারু এহইয়াউত তুরাসিল আরাবী) ১/৪৭।

৯. ইবন হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ (মিশর, কায়রো: দারুর রাইয়ান, ১ম সংস্করণ, ১৯৭৮) ১/১৮৩।

বর্ণনা করেছেন, কিন্তু এই তথ্যটির জন্য কোনো সনদ উল্লেখ করেননি। কোথা থেকে তিনি এই তথ্যটি গ্রহণ করেছেন তাও জানাননি বা সনদসহ প্রথম শতাব্দীর কোনো সাহাবী বা তাবেয়ী থেকে মতটি বর্ণনা করেননি। এ জন্য অনেক গবেষক এই মতটিকে দুর্বল বলে উল্লেখ করেছেন[১০]।

৮. অন্য মতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্ম তারিখ ১৭ রবিউল আউয়াল।

৯. অন্য মতে তাঁর জন্ম তারিখ ২২ রবিউল আউয়াল।

১০. অন্য মতে তিনি রবিউস সানী মাসে জন্মগ্রহণ করেছেন।

১১. অন্য মতে তিনি রজব জন্মগ্রহণ করেছেন। ।

১২. অন্য মতে তিনি রমযান মাসে জন্মগ্রহণ করেছেন। তৃতীয় হিজরী শতকের প্রখ্যাত ঐতিহাসিক যুবাইর ইবন বাক্কার (২৫৬ হি.) থেকে এই মতটি বর্ণিত। তার মতের পক্ষে যুক্তি হলো যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বসম্মতভাবে রমাদ্বান মাসে নবুওয়াত পেয়েছেন। তিনি ৪০ বছর পূর্তিতে নবুওয়াত পেয়েছেন। তাহলে তার জন্ম অবশ্যই রমাদ্বানে হবে।[১১]

---

১০. মাহদী রেজকুল্লাহ আহমদ, আস-সীরাতুন নাবাবিয়াহ, পৃ. ১০৯।

১১. ইবন সা‘দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা (১/১০০-১০১); ইবন কাসীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (বৈরুত: দারুল ফিকর, ১ম সংস্করণ, ১৯৯৬) ২/২১৫; আল-কাসতালানী, আহমদ বিন মুহাম্মাদ, আল-মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়্যাহ (বৈরুত: দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ ১৯৯৬) ১/৭৪-৭৫, আল-যারকানী: শরহুল মাওয়াহিব আল-লাদুন্নিয়্যাহ (বৈরুত: দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ ১৯৯৬) ১/২৪৫-২৪৮; ইবনে রাজাব, লাতায়েফুল মায়ারেফ, প্রাগুক্ত (১/১৫০)।

২. মীলাদুন্নবী বা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মদিবস পালন বা উদযাপন:

ক. পূর্বকথা

উপরের আলোচনা থেকে আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মবার, জন্মমাস ও জন্ম তারিখ সম্পর্কে হাদীস ও ঐতিহাসিকদের মতামত জানতে পেরেছি। তাঁর জন্মদিন সম্পর্কে ইসলামের প্রথম যুগগুলোর আলেম ও ঐতিহাসিকদের মতামতের বিভিন্নতা থেকে আমরা সহজেই অনুমান করতে পারছি যে, প্রথম যুগে, সাহাবী, তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মদিন পালন বা উদযাপন করার প্রচলন ছিল না। কারণ তাহলে এ ধরনের মতবিরোধের কোনো সুযোগ থাকত না। মুহাদ্দিস, ফকিহ ও ঐতিহাসিকদের গবেষণা আমাদের এই অনুমানকে সত্য প্রমাণিত করছে।

আমরা জানি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মদিন পালন বা রবিউল আউয়াল মাসে 'ঈদে মীলাদুন্নবী' পালনের বৈধতা ও অবৈধতা নিয়ে আলেম সমাজে অনেক মতবিরোধ হয়েছে, তবে মীলাদুন্নবী উদযাপনের পক্ষের ও বিপক্ষের সকল আলেম ও গবেষক একমত যে, ইসলামের প্রথম শতাব্দিগুলোতে 'ঈদে মীলাদুন্নবী' বা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মদিন পালন করা বা উদযাপন করার কোনো প্রচলন ছিল না। নবম হিজরী শতকের অন্যতম আলেম ও ঐতিহাসিক আল্লামা ইবন হাজর আল-আসকালানী (মৃত্যু ৮৫২ হি., ১৪৪৯ খ্রি.) লিখেছেন: "মাওলিদ পালন মূলত বিদ'আত। ইসলামের সম্মানিত প্রথম

তিন শতাব্দীর সালাফে সালেহীনের কোনো একজনও এ কাজ করেননি।"[১২]

নবম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের প্রখ্যাত মুদাদ্দিস ও ঐতিহাসিক আল্লামা আবুল খাইর মুহাম্মাদ ইবন আব্দুর রহমান আস-সাখাবী (মৃত্যু ৯০২ হি., ১৪৯৭ খ্রি.) লিখেছেন: 'ইসলামের সম্মানিত প্রথম তিন যুগের সালাফে সালেহীনের (সাহাবী, তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীদের) কোনো একজন থেকেও মাওলিদ পালনের কোনো ঘটনা খুজে পাওয়া যায় না। মাওলিদ পালন বা উদযাপন পরবর্তী যুগে উদ্ভাবিত হয়েছে। এরপর থেকে সকল দেশের ও সকল বড় বড় শহরের মুসলিমগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মমাস পালন করে আসছেন। এ উপলক্ষে তারা অত্যন্ত সুন্দর জাঁকজমকপূর্ণ উৎসবময় খানাপিনার মাহফিলের আয়োজন করেন, এ মাসের রাত্রে তারা বিভিন্ন রকমের দান-সাদাকাহ করেন, আনন্দ প্রকাশ করেন এবং জনকল্যাণমূলক কর্ম বেশি করে করেন। এ সময়ে তারা তাঁর জন্মকাহিনী পাঠ করতে মনোনিবেশ করেন।'[১৩]

লাহোরের প্রখ্যাত আলেম সাইয়েদ দিলদার আলী (১৯৩৫ খ্রি.) মীলাদের সপক্ষে আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন: 'মীলাদের কোনো আসল বা সুত্র প্রথম তিন যুগের (সাহাবী, তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীগণ) কোনো সালাফে

১২. আস-সালেহী, মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ, সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ ফী সীরাতি খাইরিল ইবাদ, আস-সীরাতুশ শামিয়্যাহ (বৈরূত: দারুল কুতুব আল- ইলমিয়্যাহ, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৩) ১/৩৬৬।

১৩. আস-সালেহী, সীরাত (১/৩৬২)।

সালেহীন থেকে বর্ণিত হয়নি; বরং তাদের যুগের পরে এর উদ্ভাবন ঘটেছে।'[১৪]

আলেমদের এই ঐকমত্যের কারণ হলো— দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দীতে সংকলিত অর্ধশতাধিক সনদভিত্তিক হাদীসের গ্রন্থ, যাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কর্ম, আচার-আচরণ, কথা, অনুমোদন, আকৃতি, প্রকৃতি ইত্যাদি সংকলিত রয়েছে, সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীদের মতামত ও কর্ম সংকলিত হয়েছে সে সকল গ্রন্থের একটিও সহীহ বা দুর্বল হাদীসে দেখা যায় না যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় বা তাঁর মৃত্যুর পরে কোনো সাহাবী সামাজিকভাবে বা ব্যক্তিগতভাবে তাঁর জন্ম উদযাপন, জন্ম আলোচনা বা জন্ম উপলক্ষে আনন্দ প্রকাশের জন্য নির্দিষ্ট কোনো দিনে বা অনির্দিষ্টভাবে বৎসরের কোনো সময়ে কোনো অনুষ্ঠান করেছেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামই ছিলেন তাদের সকল আলোচনা, সকল চিন্তা চেতনার প্রাণ, সকল কর্মকাণ্ডের মূল। তারা রাহমাতুল্লিল আলামীনের (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জীবনের ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর ঘটনা নিয়ে আলোচনা করেছেন, তাঁর জীবনের বিভিন্ন ঘটনা আলোচনা করে তাঁর ভালোবাসায় চোখের পানিতে বুক ভিজিয়েছেন। তাঁর আকৃতি, প্রকৃতি, পোশাক-পরিচ্ছদের কথা আলোচনা করে জীবন অতিবাহিত করেছেন। কিন্তু তারা কখনো তাঁর জন্মদিন পালন করেননি। এমনকি তাঁর জন্মমুহূর্তের ঘটনাবলি আলোচনার জন্যও তারা কখনো বসেননি বা কোনো দান-সাদাকাহ, তিলাওয়াত ইত্যাদির মাধ্যমেও কখনো

১৪. সাইয়েদ দিলদার আলী, রাসূলুল কালাম ফিল মাওলিদ ওয়াল কিয়াম (লাহোর), পৃ. ১৫।

তাঁর জন্ম উপলক্ষে আনন্দ প্রকাশ করেননি। তাদের পরে তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীদের অবস্থাও তাই ছিল।

বস্তুত কারো জন্ম বা মৃত্যুদিন পালন করার বিষয়টি আরবের মানুষের কাছে একেবারেই অজ্ঞাত ছিল। জন্মদিন পালন করা অনারবীয় সংস্কৃতির অংশ। প্রথম যুগের মুসলিমগণ তা জানতেন না। পারস্যের মাজুস (অগ্নি উপাসক) ও বাইজেন্টাইন খ্রিস্টানদের ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল জন্মদিন, মৃত্যুদিন ইত্যাদি পালন করা। তবে প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে পারস্য, সিরিয়া, মিসর ও এশিয়া মাইনরের যে সকল মানুষ ইসলামের ছায়াতলে আসেন তারা জীবনের সকল ক্ষেত্রে সাহাবীদের অনুসরণ অনুকরণ করতেন এবং তাদের জীবনাচারণে আরবীয় রীতিনীতিরই প্রাধান্য ছিল। হিজরী তৃতীয় শতাব্দী থেকে মুসলিম সাম্রাজ্যে অনারব পারসিয়ান ও তুর্কী মুসলিমদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর থেকে মুসলিম সাম্রাজ্যে বিভিন্ন নতুন নতুন সামাজিক ও ধর্মীয় রীতিনীতির প্রচলন ঘটে, তন্মধ্যে পবিত্র ঈদে মীলাদুন্নবী অন্যতম।

খ. ঈদে মীলাদুন্নবী উদযাপন: প্রাথমিক প্রবর্তন ও সীমিত উদযাপন

আমরা জানতে পারলাম প্রথম যুগগুলোর পরে মীলাদ অনুষ্ঠান বা ঈদে মীলাদুন্নবী উদযাপনের শুরু হয়েছে। কিন্তু কবে থেকে? কে শুরু করলেন? আসুন আমরা তাদের সাথে পরিচিত হই এবং কীভাবে তারা এই অনুষ্ঠান পালন করতেন তা জানার চেষ্টা করি।

ইতিহাসের আলোকে যতটুকু জানতে পেরেছি, দুই ঈদের বাইরে কোনো দিবসকে সামাজিকভাবে উদযাপন শুরু হয় হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে শিয়াদের উদ্যোগে। সর্বপ্রথম ৩৫২ হিজরীতে (৯৬৩ খ্রি.) বাগদাদের আব্বাসী খলীফার প্রধান প্রশাসক ও রাষ্ট্রের প্রধান নিয়ন্ত্রক বনী

বুয়াইহির শিয়া শাসক মুইজ্জুদ্দৌলা ১০ মুহাররাম আশুরাকে শোক দিবস ও যিলহজ মাসের ৮ তারিখ গাদীর খুম দিবস উৎসব দিবস হিসেবে পালন করার নির্দেশ দেন। তার নির্দেশে এই দুই দিবস সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় মর্যাদার সাথে পালন করা হয়। যদিও শুধুমাত্র শিয়ারাই এই দুই দিবস পালনে অংশ গ্রহণ করেন, তবুও তা সামাজিক রূপ গ্রহণ করে। কারণ রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার ফলে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ প্রথম বৎসরে এই উদযাপনে বাধা দিতে পারেননি। পরবর্তী যুগে যতদিন শিয়াদের প্রতিপত্তি ছিল এই দুই দিবস উদযাপন করা হয়, যদিও তা মাঝে মাঝে শিয়া-সুন্নী ভয়ংকর সংঘাত ও গৃহযুদ্ধের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।[১৫]

ঈদে মীলাদুন্নবী উদযাপন করার ক্ষেত্রেও শিয়ারা অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। উবাইদ বংশের রাফেযী ইসমাঈলী শিয়ারা[১৬] ফাতেমী বংশের নামে আফ্রিকার উত্তরাংশে রাজত্ব স্থাপন করে। ৩৫৮ হিজরীতে (৯৬৯ খ্রি.) তারা মিশর দখল করে তাকে ফাতেমী রাষ্ট্রের কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলে এবং পরবতী ২ শতাব্দীরও অধিককাল মিশরে তাদের শাসন ও কর্তৃত্ব বজায় থাকে। গাজী সালাহুদ্দীন আইয়ুবীর মিশরের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণের মাধ্যমে ৫৬৭ হিজরীতে (১১৭২ খ্রি.) মিশরের ফাতেমী শিয়া রাজবংশের সমাপ্তি ঘটে।[১৭]

---

১৫. ইবন কাসীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, প্রাগুক্ত (৭/৬৪২, ৬৫৩), (৮/৩, ৯, ১১, ১৫, ১৬, ১৭)।

১৬. আগাখানী, বুহরা, বাতেনী শিয়াদের পূর্বপুরুষ।

১৭. বিস্তারিত দেখুন: মাহমূদ শাকির, আত-তারিখুল ইসলামী (বৈরুত: আল-মাকতাব আল-ইসলামী, ১ম সংস্করণ ১৯৮৫ খ্রি.) ৬/১১১-১১২, ১২৩-১২৪, ১৩৬-১৩৭, ১৬৫-১৬৮, ১৮০-১৮২, ১৯৩-১৯৬, ২০৮-২০৯, ২৩৩, ২৪৮, ২৬৫, ২৮৭-২৮৯, ৩০৩-৩০৭।

এই দুই শতাব্দীর শাসনকালে মিশরের ইসমাঈলী শিয়া শাসকরা রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দুই ঈদ ছাড়াও আরো বিভিন্ন দিন পালন করতো, তন্মধ্যে অধিকাংশই ছিল জন্মদিন। তারা অত্যন্ত আনন্দ, উৎসব ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে ৫টি জন্মদিন পালন করতো:

১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মদিন,

২. আলী রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুর জন্মদিন,

৩. ফাতেমা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহার জন্মদিন,

৪. হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুর জন্মদিন ও

৫. হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুর জন্মদিন।

এ ছাড়াও তারা তাদের জীবিত খলীফার জন্মদিন পালন করতেন এবং 'মীলাদ' নামে ঈসা 'আলাইহিস সালামের জন্মদিন (বড়দিন বা ক্রীসমাস), যা মিশরের খ্রিস্টানদের মধ্যে প্রচলিত ছিল তা আনন্দপ্রকাশ, মিষ্টি ও উপহার বিতরণের মধ্য দিয়ে উদযাপন করতো।[১৮]

গ. ঈদে মীলাদুন্নবীর প্রাথমিক উদযাপন: যুগ ও প্রবর্তক পরিচিতি

হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে মিশরে এই উদযাপন শুরু হয়। এ যুগকে আব্বাসীয় খেলাফতের দুর্বলতার যুগ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন ঐতিহাসিকগণ। আব্বাসীয় খেলাফতের প্রথম অধ্যায় শেষ হয় ২৩২ হি. (৮৪৭ খ্রি.) নবম আব্বাসী খলিফা ওয়াসিক বিল্লাহ'র মৃত্যুর মধ্য দিয়ে।

১৮. আল-মাকরীযী, আহমদ বিন আলী, আল-মাওয়ায়িজ ওয়াল ইতিবার বি যিকরিল খুতাতি ওয়াল আছার (মিশর, কায়রো: মাকতাবাতুস সাকাফা আদ দীনিয়্যাহ), পৃ. ৪৯০-৪৯৫।

এরপর সুবিশাল মুসলিম সাম্রাজ্যে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবনতির সূচনা হয়। কারণ কেন্দ্রীয় প্রশাসন দুর্বল হয়ে পড়ে। বিশাল সাম্রাজ্য বিভিন্ন ছোট ছোট রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে যায়। এসকল রাষ্টের মধ্যে অবিরত যুদ্ধ বিগ্রহ চলতে থাকে। এছাড়া কেন্দ্রীয় প্রশাসনের দুর্বলতার কারণে বিভিন্ন এলাকায় সংঘবদ্ধ দুর্বৃত্তরা লুটতরাজ চালানোর সুযোগ পায়। সামাজিক নিরাপত্তা ব্যহত হয়। বিশেষ করে ৩৩৪ হি. (৯৪৫ খ্রি.) থেকে বাগদাদে শিয়া মতাবলম্বী বনু বুয়াইহ শাসকরা সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হয়ে যায়, ফলে ইসলামী জ্ঞানচর্চা, হাদীস ও সুন্নাতের অনুসরণ ব্যহত হয়। রাফেযী শিয়া মতবাদের প্রসার ঘটতে থাকে। অপরদিকে সংখ্যাগরিষ্ঠ সুন্নী জনগণ শিয়াদের বাড়াবাড়িতে অতিষ্ঠ হয়ে প্রতিবাদ করলে তা অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিয়া-সুন্নী সংঘর্ষ ও গৃহযুদ্ধের রূপ ধারণ করত। এ সকল সংঘর্ষ মূলত দেশের সার্বিক অবস্থার আরো অবনতি ঘটাত। আভ্যন্তরীণ অশান্তি ও অনৈক্য বহিঃশত্রুর আগ্রাসনের কারণ হয়। এশিয়া মাইনর, আর্মেনীয়া ও মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন খ্রিস্টান শাসক সুযোগমত ইসলামী সম্রাজ্যের অভ্যন্তরে আগ্রাসন চালাতে থাকে। এছাড়া ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অপপ্রচার ও উস্কানীমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে থাকে। এই পরিস্থিতিতে জ্ঞানচর্চা, ধর্মীয় মূল্যবোধের বিকাশ ব্যহত হয়। অপরদিকে সমাজের মানুষের মধ্যে বিলাসিতা ও পাপাচারের প্রসার ঘটতে থাকে। সমাজের বিভিন্ন স্তরে ইসলাম বিরোধী আচার আচরণ, কুসংস্কার, ধর্মীয় বিকৃতি ছড়িয়ে পড়ে।[১৯]

১৯. বিস্তারিত দেখুন: ইবন কাসীর: আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, মাহমূদ শাকির, আত-তারিখ আল-ইসলামী, ৫ম ও ৬ষ্ঠ খণ্ড।

এই যুগের বিচ্ছিন্ন ইসলামী সম্রাজ্যের একটি বিশেষ অংশ ও ইসলামী সভ্যতার অনত্যম কেন্দ্র মিশরে ফাতেমী খলীফা আল-মুয়িজ্জু লি-দীনিল্লাহ সর্বপ্রথম ঈদে মীলাদুন্নবী, অন্যান্য জন্মদিন পালন ও সে উপলক্ষে বিভিন্ন উৎসবের শুরু করেন।[২০] তিনি ৩৫৮ হিজরীতে মিসর অধিকার করেন এবং কায়রো শহরের পত্তন করেন। তিনি সিরিয়া ও হেজাজের বিভিন্ন অঞ্চল ও তার অধীনে আনেন। ৩৬২ হিজরীতে (৯৭২ খ্রি.) মুয়িজ্জ কায়রো প্রবেশ করেন এবং কায়রোকেই তার রাজধানী হিসেবে গ্রহণ করেন। ৩৬৫ হিজরীতে তিনি মারা যান। তার শাসনামলে মিশরে শিয়া শাসকদের যে সকল উৎসবাদি প্রচলিত হয় তার অন্যতম ছিল ঈদে মীলাদুন্নবী উৎসব।[২১]

আল-মুয়িজ্জ এর প্রচলিত এই ঈদে মীলাদুন্নবী ও অন্যান্য জন্মদিন পালন ও উদযাপন পরবর্তী প্রায় ১০০ বৎসর কায়রোতে শিয়াদের মধ্যে এই উৎসব চালু থাকে। ৪৮৭ হি. (১০৯৪ খ্রি.) ফাতেমী খলীফা আল-মুসতানসিরের মৃত্যু হলে সেনাপতি আল-আফযাল ইবন বদর আল-জামালীর সহযোগিতায় মুস্তানসিরের ছোট ছেলে ২১ বৎসর বয়স্ক আল-

---

২০. বিস্তারিত দেখুন: যাহাবী, মুহাম্মাদ ইবনে আহমদ ইবনে ওসমান, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা' (বৈরুত: মুয়াস্সাসাতুর রিসালা, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, ১৯৮৯ খ্রি.) ১৫/১৪১-১৫৯; আল-শাহরাস্তানী, আল-মিলাল ওয়ান নিহাল (বৈরুত: দারুল মা'রিফা, ১৯৮০ খ্রি.) ১/১৯১-১৯৮, ওয়ামী, আল-মাউসূয়া আল-মুয়াসসারা (রিয়াদ, ওয়ামী: ১ম সংস্করণ, ১৯৮৮), পৃ. ৪৫-৫২।

২১. যাহাবী, নুবালা (১৫/১৬৪)। আরো দেখুন: ইবনে খাল্লিকান, ওয়াফাইয়াতুল আ'ইয়ান (ইরান, কূম, মানশুরাতুশ শরীফ আর-রাযী, ২য় সংস্করণ) ৫/২২৪-২২৮; আল-যিরিকলী, আল-আলাম (বৈরুত: দারুল ইলম লিল মালাঈন, ৯ম সংস্করণ, ১৯৯০ খ্রি.) ৭/২৬৫।

মুস্তা'লী খলীফা হন। সেনাপতি আফযাল সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হয়ে পড়েন। তিনি ৪৮৮ হিজরীতে ফাতেমীদের প্রচলিত ঈদে মীলাদুন্নবী উৎসব ও অন্যান্য জন্মদিনের উৎসব বন্ধ করে দেন। পরবর্তী কোনো কোনো ফাতেমী শাসক পুনরায় এ সকল উৎসব সীমিত পরিসরে চালু করেন, তবে ক্রমান্বয়ে ফাতেমীদের প্রতিপত্তি সঙ্কুচিত হতে থাকে এবং এ সকল উৎসব জৌলুস হারিয়ে ফেলে।[২২]

ঘ. ঈদে মীলাদুন্নবীর প্রাথমিক উদযাপন: অনুষ্ঠান পরিচিতি

আহমদ ইবন আলী আল-কালকাশান্দী (৮২১ হি.) লিখেছেন: 'রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখে ফাতেমী শিয়া শাসক মীলাদুন্নবী উদযাপন করতেন। তাদের নিয়ম ছিল যে, এ উপলক্ষে বিপুল পরিমাণে উন্নত মানের মিষ্টান্ন তৈরি করা হতো। এই মিষ্টান্ন ৩০০ পিতলের খাঞ্চায় ভরা হতো। মীলাদের রাত্রিতে এই মিষ্টান্ন সকল তালিকাভুক্ত রাষ্ট্রীয় দায়িত্বশীলদের মধ্যে বিতরণ করা হতো, যেমন প্রধান বিচারক, প্রধান শিয়া মত প্রচারক, দরবারের কারীগণ, বিভিন্ন মসজিদের খতীব ও প্রধানগণ, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানদির ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ। এ উপলক্ষে খলীফা প্রাসাদের সামনের ব্যালকনীতে বসতেন। আসরের সালাতের পরে বিচারপতি বিভিন্ন শ্রেণির কর্মকর্তাদের সঙ্গে আজহার মসজিদের গমন করতেন এবং সেখানে এক খতম কুরআন তিলাওয়াত পরিমাণ সময় বসতেন। মসজিদ ও প্রাসাদের মধ্যবর্তী স্থানে অভ্যাগত পদস্থ মেহমানগণ বসে খলীফাকে সালাম প্রদানের জন্য অপেক্ষা করতেন। এ সময়ে ব্যালকনির জানালা খুলে হাত নেড়ে

---

২২. ইজ্জত আলী আতিয়্যাহ, আল-বিদয়াত (বৈরুত: দারুল কিতাব আল-আরাবী, ২য় সংস্করণ, ১৯৮০ খ্রি.), পৃ. ৪১১; ইসমাঈল বিন মুহাম্মাদ আল-আনসারী, আল-কাউলুল ফাসল (সৌদী আরব, রিয়াদ: আর-রিয়াসা আল-আমাহ লি ইদারাতিল বুহুস, ১৯৮৫ খ্রি.), পৃ. ৬৪-৭২।

খলিফা তাদের সালাম গ্রহণ করতেন। এরপর ক্বারীগণ কুরআন তিলাওয়াত করতেন এবং বক্তাগণ বক্তৃতা প্রদান করতেন। বক্তৃতা অনুষ্ঠান শেষ হলে খলীফার সহচরগণ হাত নেড়ে সমবেতদের বিদায়ী সালাম জানাতেন। খিড়কী বন্ধ করা হতো এবং উপস্থিত সকলে নিজ নিজ ঘরে ফিরতেন। এভাবেই তারা আলী রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুর জন্মদিনও পালন করত...।'[২৩]

আহমদ ইবন আলী আল-মাকরীযী (৮৪৫ হি.) এ সকল জন্মদিন উৎসবের বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছেন: 'এ সকল জন্মদিনের উৎসব ছিল তাদের খুবই বড় ও মর্যাদাময় উৎসব সময়। এ সময়ে মানুষেরা সোনা ও রূপার স্মারক তৈরি করত, বিভিন্ন ধরনের খাবার, মিষ্টান্ন ইত্যাদি তৈরি করে বিতরণ করা হতো।'[২৪]

৩. ঈদে মীলাদুন্নবী উদযাপন: প্রকৃত প্রবর্তন ও ব্যাপক উদযাপন

এভাবে আমরা দেখতে পাই যে, হিজরী চতুর্থ শতাব্দী থেকেই ঈদে মীলাদুন্নবী উদযাপন শুরু হয়। তবে এখানে লক্ষণীয় যে, কায়রোর এই উৎসব মুসলিম বিশ্বের অন্যত্র ছড়িয়ে পড়েনি। সম্ভবত ইসমাঈলীয় ফাতেমী শিয়াদের প্রতি সাধারণ মুসলিম সমাজের প্রকট ঘৃণার ফলেই তাদের এই উৎসবসমূহ অন্যান্য সুন্নী এলাকায় জনপ্রিয়তা পায়নি বা সামাজিক উৎসবের রূপ গ্রহণ করেনি। তবে ঐতিহাসিকদের বর্ণনা থেকে জানা যায়

২৩. আল-কালকাশান্দী, সুবহুল আ'শা (মিশর: সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়) ৩/৪৯৮-৪৯৯। অথচ এটাও সত্য যে, আলী রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুর জন্মদিন নির্ধারণও কোনো প্রমাণিত বিষয় নয়।

২৪. আল-মাকরীযি, আল-মাওয়ায়িজ ওয়াল ইতিবার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯১।

যে, ষষ্ঠ হিজরীর দ্বিতীয়ার্ধ (৫৫০-৬০০) থেকেই মিশর, সিরিয়া বা ইরাকের ২/১ জন ধার্মিক মানুষ প্রতি বৎসর রবিউল আউয়াল মাসের প্রথমাংশে বা ৮ বা ১২ তারিখে খানাপিনার মজলিস ও আনন্দ প্রকাশের মাধ্যমে 'ঈদে মীলাদুন্নবী' পালন করতে শুরু করেন।[২৫]

তবে যিনি ঈদে মীলাদুন্নবীর প্রবর্তক হিসেবে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ এবং যিনি ঈদে মীলাদুন্নবীকে মুসলিম বিশ্বের অন্যতম উৎসব হিসেবে প্রতিষ্ঠা দানের কৃতিত্বের দাবিদার তিনি হচ্ছেন ইরাক অঞ্চলের ইরবিল প্রদেশের শাসক আবু সাঈদ কূকবুরী (মৃত্যু: ৬৩০ হি.)। পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহে আমরা তার জীবনী ও ঈদে মীলাদুন্নবী উদযাপনে তার পদ্ধতি আলোচনা করব। কিন্তু তার আগে আমরা যে যুগের প্রেক্ষাপটে তিনি এই উৎসবের প্রচলন করেন তা আলোচনা করব।

ক. যুগ পরিচিতি: হিজরী ষষ্ঠ ও সপ্তম শতক

চতুর্থ হিজরী শতকে মুসলিম জগতের অবস্থা কী ছিল তা আমরা ইতঃপূর্বে আলোচনা করেছি। পরবর্তী সময়ে অবস্থার আরো অবনতি ঘটে। ষষ্ঠ হিজরী শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে সপ্তম হিজরী শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত সময়কাল ছিল মুসলিম উম্মাহর জন্য দুর্দিন ও মুসলিম ইতিহাসের এক বেদনাদায়ক অধ্যায়। এ সময়ে আভ্যন্তরীণ দুর্বলতা ও বহিঃশত্রুর আক্রমণে বিধ্বস্ত হয় বিশাল মুসলিম রাজত্বের অধিকাংশ এলাকা।

ষষ্ঠ হিজরী শতাব্দী মাঝামাঝি এসে আমরা দেখতে পাই যে, এ সকল আভ্যন্তরীণ সমস্যার পাশাপাশি আরো একটি কঠিন সমস্যা মুসলিম উম্মাহর সামনে এসেছে, তা হলো বহিঃশত্রুর আক্রমণ, বিশেষ করে পশ্চিম থেকে

২৫. আস-সালেহী, সীরাত শামিয়্যাহ, প্রাগুক্ত (১/৩৬৩, ৩৬৫)।

ইউরোপীয় ক্রুসেডারদের আক্রমণ এবং পূর্ব থেকে তাতার ও মোগলদের আক্রমণ।

ক্রুসেড যুদ্ধ শুরু হয় হিজরী ৫ম শতাব্দীর (খ্রিস্টীয় একাদশ শতাব্দীর) শেষ দিকে। ইসলামের আবির্ভাবের পর থেকেই অন্ধকারাচ্ছন্ন ইউরোপে খ্রিস্টান ধর্মযাজকগণ বিভিন্নভাবে ইসলাম ও মুসলিম বিরোধী প্রচারণা করতে থাকেন। তারা বলতে থাকে যে, মুসলিমগণ মূর্তিপূজা করেন, তারা মুহাম্মাদের (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পূজা করেন, নরমাংশ ভক্ষণ করেন, যিশুখ্রিস্টের অবমাননা করেন ইত্যাদি কথা সারা ইউরোপে প্রচারিত হতে থাকে। পাশাপাশি মুসলিমদের স্পেন বিজয় ও পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশ বিজয় ইউরোপের খ্রিস্টান শাসকদেরকে ভীত করে তোলে। তারা তাদের আভ্যন্তরের ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও জাতিগত বিভেদ ও শত্রুতা ভুলে পোপের নেতৃত্বে প্যালেস্টাইনের পবিত্র ভূমি উদ্ধারের নামে লক্ষ লক্ষ সৈনিকের ঐক্যবদ্ধ ইউরোপীয় বাহিনী নিয়ে মুসলিম সাম্রাজ্যের ওপর আক্রমণ চালাতে থাকেন। ৪৯১ ও ৪৯২ হিজরী সালে (১০৯৭ ও ১০৯৮ খ্রি.) প্রথম ক্রুসেড বাহিনীর দশ লক্ষাধিক নিয়মিত সৈনিক ও স্বেচ্ছাসেবক এশিয়া মাইনর ও সিরিয়া এলাকায় বিভিন্ন মুসলিম দেশে হামলা করেন। এই হামলায় প্রায় ২০ সহস্রাধিক মুসলিম সাধারণ নাগরিক নিহত হন। ক্রুসেড বাহিনী নির্বিচারে নারী-পুরুষ ও শিশুদের হত্যা করে। তারা ক্ষেত-খামার ও ফসলাদিও ধ্বংস করে। এই হামলার মাধ্যমে এশিয়া মাইনর ও সিরিয়া-প্যালেস্টাইনের বিভিন্ন রাজ্য খ্রিস্টানরা দখল করে এবং কয়েকটি খ্রিস্টান রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে।[২৬]

২৬. মাহমুদ শাকির, প্রাগুক্ত (৬/৩৪-৩৮, ২৫২-২৫৭)।

পরবর্তী ২০০ বৎসরের ইতিহাস ইউরোপীয় খ্রিস্টান বাহিনীর উপর্যুপরি হামলা ও মুসলিম প্রতিরোধের ইতিহাস। এ সময়ে খ্রিস্টানরা মিসর, সিরিয়া ও ইরাকের বিভিন্ন অঞ্চলে খ্রিস্টান রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। দ্বিধাবিভক্ত মুসলিম শাসকগণ বিভিন্নভাবে প্রতিরোধের চেষ্টা করেন এবং সর্বশেষ ৬ষ্ঠ হিজরী শতাব্দীর শেষদিকে সালাহুদ্দীন আইয়ুবী অধিকাংশ খ্রিস্টান রাজ্যের পতন ঘটান এবং প্যালেস্টাইন ও অধিকাংশ আরব এলাকা থেকে ক্রুসেডিয়ারদের বিতাড়িত করেন।[২৭] এরপরেও মিশর, সিরিয়া ও লেবানন এলাকায় ক্রুসেডারদের কয়েকটি ছোট ছোট খ্রিস্টান রাজ্য রয়ে যায়। তদুপরি ইউরোপ থেকে মাঝেমাঝে ক্রুসেড বাহিনীর আগমন ও বিভিন্ন মুসলিম অঞ্চলে আক্রমণ অব্যহত থাকে।[২৮]

যে সময়ে মুসলিমগণ দখলদার ক্রুসেড বাহিনীর কবল থেকে বিভিন্ন মুসলিম অঞ্চলকে মুক্ত করছেন, সে সময়ে, ৭ম হিজরী শতকের (১৩শ খ্রিস্টীয় শতকের) শুরুতে মুসলিম সম্রাজ্যের পূর্বদিক থেকে তাতারদের বর্বর হামলা শুরু হয়। চেঙ্গিশ খানের নেতৃত্বে তাতার বাহিনী সর্বপ্রথম ৬০৬ হিজরীর দিকে (১২০৯ খ্রি.) মুসলিম রাজত্বের পূর্বাঞ্চলে হামলা চালাতে শুরু করে। শীঘ্রই তারা বিভিন্ন মুসলিম জনপদে হামলা চালিয়ে তা ধ্বংস করতে থাকে। মানব ইতিহাসের বর্বরতম হামলায় তারা এ সকল জনপদের সকল প্রাণীকে নির্বিচারে হত্যা করতে থাকে। বস্তুত তাতাররা মধ্য এশিয়া, পারস্য, ইরাক, সিরিয়া ও এশিয়া মাইনরের অধিকাংশ মুসলিম জনপদ শাব্দিক অর্থেই বিরাণ করে দেয়। পরবর্তী শতাব্দীর ঐতিহাসিক

---

২৭. প্রাগুক্ত (৬/২৫৯-৩৫৬)।

২৮. বিস্তারিত দেখুন: যাহাবী, আল-ই'বার ফী খাবারি মান গাবার (বৈরুত: দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ) ৩/১২৮-৩১২।

আল্লামা যাহাবী (মৃত্যু ৭৪৮হি.) বলেন, "তাতাররা এসকল জনপদে কত মানুষকে নির্বিচারে হত্যা করেছে এ প্রশ্ন অবান্তর ও অর্থহীন, বরং প্রশ্ন করতে হবে: তারা কতজনকে না মেরে বাঁচিয়ে রেখেছিল।"[২৯] ৬৫৬ হিজরীতে (১২৫৮ খ্রি.) হালাকু খানের নেতৃত্বে তাতাররা মুসলিম সাম্রাজ্যের প্রাণকেন্দ্র ও রাজধানী বাগদাদ ধ্বংস করে। ৪০ দিনব্যাপী গণহত্যায় তারা বাগদাদের প্রায় ২০ লক্ষ মানুষকে হত্যা করে।[৩০] পরবর্তী শতাব্দীর ঐতিহাসিক আল্লামা যাহাবী লিখেছেন: "হালাকু মৃতদেহ গণনা করতে নির্দেশ দেয়। গণনায় মৃতদেহের সংখ্যা হয় ১৮ লক্ষের কিছু বেশি। তখন (নিহতের সংখ্যায় তৃপ্ত হয়ে) হালাকু হত্যাকাণ্ড থামানোর ও নিরাপত্তা ঘোষণার নির্দেশ দেয়।"[৩১]

বাইরের শত্রুর পাশাপাশি আভ্যন্তরীণ কলহ ও দুর্বলতা এ যুগে মুসলিম সমাজগুলোকে বিপর্যস্ত করে তোলে। কোনো কোনো আঞ্চলিক শাসক নিজের এলাকায় কিছু শান্তি-শৃঙ্খলা ও স্থিতিশীলতা আনতে পারলেও সার্বিকভাবে বিশাল মুসলিম সাম্রাজ্যের আইন শৃঙ্খলার চরম অবনতি ঘটে।[৩২]

পরবতী শতাব্দীর প্রখ্যাত ঐতিহাসিক আল্লামা ইবন কাসীর (৭৭৪ হি.), যিনি নিকট থেকে এ যুগের ঘটনাবলি জেনেছেন, তাতারদের নারকীয় বর্বরতার বর্ণনা দেওয়ার একপর্যায়ে লিখেন: ৬১৭ হিজরী (১২২০ খ্রি.)

---

২৯. যাহাবী, প্রাগুক্ত (৩/১৭২)।

৩০. মাহমুদ শাকির, প্রাগুক্ত ৬/৩৯-৪১, ৩৪৫-৩৫৬; যাহাবী, আল-ইবার, প্রাগুক্ত ৩/২৭৮।

৩১. যাহাবী, আল-ই'বার, প্রাগুক্ত (৩/২৮৭)।

৩২. বিস্তারিত দেখুন: যাহাবী, আল-ই'বার, প্রাগুক্ত (৩/১১-২৮৫)।

চেঙ্গিশ খান ও তার বাহিনীর বর্বর হামলা সমস্ত মুসলিম বিশ্বকে গ্রাস করে। এক বছরের মধ্যে তারা প্রায় সমগ্র মুসলিম জনপদ দখল করে নেয় (বাগদাদ ও পার্শ্ববর্তী এলাকা বাদ ছিল)।...তারা এ বছরে বিভিন্ন বড়বড় শহরে মুসলিম ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের অগণিত মানুষকে হত্যা করে। মোটের ওপর তারা যে দেশেই প্রবেশ করেছে সেখানকার সকল সক্ষম পুরুষ ও অনেক মহিলা ও শিশুকে হত্যা করেছে। গর্ভবতী মহিলাদেরকে হত্যা করে তাদের পেট ফেড়ে গর্ভস্থ শিশুকে বের করে হত্যা করেছে। যে সকল দ্রব্য তাদের প্রয়োজন তা তারা লুটপাট করেছে। আর যা তাদের দরকার নেই তা তারা পুড়িয়ে নষ্ট করে দিয়েছে। ঘর-বাড়ী সবই তারা ধ্বংস করেছে বা পুড়িয়ে দিয়েছে।... মানব সভ্যতার শুরু থেকে এ পর্যন্ত এত ভয়াবহ বিপর্যয় ও বিপদ কখনো মানুষ দেখেনি...ইতিহাসে এত বড় বর্বরতার কোনো বিবরণ আর পাওয়া যায় না।[৩৩]

এভাবে তাতারদের আগ্রাসন, ক্রুসেড হামলা, সামগ্রিক আইনশৃঙ্খলার অবনতি সমগ্র মুসলিম জাহানকে এমনভাবে গ্রাস করে যে, ৬২৮ হিজরীর (১২৩১ খ্রি.) পরে অনেক বছর মুসলিমরা ইসলামের পঞ্চম রোকন হজ পালন করতে পারেনি। ঐতিহাসিক ইবন কাসীর লিখছেন: "৬২৮ হিজরীতে মানুষেরা হজ আদায় করেন। এরপরে যুদ্ধ-বিগ্রহ, তাতার ও ক্রুসেডিয়ারদের ভয়ে আর কেউ হজে যেতে পারেননি। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।"[৩৪]

ইসলামী অনুশাসনের অবহেলা, পাপ-অনাচারের প্রসার, প্রশাসনিক দুর্বলতা, যুলুম-অত্যাচারের সয়লাবের কারণে মুসলিমদের মধ্যে নেমে আসে

৩৩. ইবন কাসীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, প্রাগুক্ত (৮/৫৯৪-৫৯৫)।

৩৪. ইবন কাসীর, প্রাগুক্ত (৯/১০)।

ঈমানী দুর্বলতা। তাতারভীতি তাদেরকে গ্রাস করে। আল্লামা ইবন কাসীর লিখেছেন: "তাতারভীতি মানুষদেরকে এমনভাবে গ্রাস করেছিল যে, একজন তাতার সৈনিক একটি বাজারে প্রবেশ করে, যেখানে শতাধিক মানুষ ছিল, তাতার সৈন্যটি একজন একজন করে সকল মানুষকে হত্যা করে বাজারটি লুট করে, খুনের এই হোলি খেলার মধ্যে একজন পুরুষও ঐ তাতারটিকে বাধা দিতে আগিয়ে আসতে সাহস পায়নি।"[৩৫]

এভাবে আমরা দেখতে পাই যে, হিজরী ৬ষ্ঠ ও ৭ম শতকের মুসলিম সমাজে চরম সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ও অশান্তি বিরাজ করছিল, যা ধর্মীয়, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও স্থবিরতা ও অবক্ষয় নিয়ে আসে। রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণে সাংস্কৃতিক ও শিক্ষার অঙ্গনে স্থবিরতা আসে। মুসলিম সাম্রাজ্যের মধ্যে বিভিন্ন খ্রিস্টান রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে মুসলিমগণ বিভিন্ন খ্রিস্টান ধর্মীয় ও সামাজিক আচার আচরণ দ্বারা প্রভাবিত হন। অপরদিকে পূর্বাঞ্চলীয় তাতার ও অন্যান্য কাফির সম্প্রদায়ের মানুষেরা মুসলিম সম্রাজ্যের বিভিন্ন এলাকা দখল করে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাদের আচার-আচরণ ও বিশ্বাস-কুসংস্কার মুসলিম সমাজে প্রবেশ করে। সর্বপোরি শিক্ষার ক্ষেত্রে স্থবিরতা আসার ফলে সমাজের মধ্যে অশিক্ষা, কুশিক্ষা ও বিভিন্ন ধরনের কুসংস্কার ছড়িয়ে পড়ে ব্যাপকভাবে।

সবকিছুর মধ্যেও কিছু কিছু রাজ্যের পৃষ্ঠপোষকতা ও তৎকালীন আলেম সমাজের চেষ্টায় ইলমের প্রসার ও ইসলামী মূল্যবোধের দিকে আহ্বানের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে। তবে বিশাল মুসলিম সমাজের প্রয়োজনের তুলনার আলেম ও সংস্কারকদের সংখ্যা কমে যেতে থাকে। এছাড়া সার্বিক

---

৩৫. ইবন কাসীর, প্রাগুক্ত (৮/৫৯৭)।

সামাজিক অস্থিরতা, অজ্ঞতা ও অবক্ষয়ের ফলে সমাজে আলেমদের আবেদন কমতে থাকে। ফলে বিভিন্ন ধরনের ইসলাম বিরোধী কর্ম সমাজে প্রবেশ করে। সমাজের সাধারণ মানুষই নয় ধার্মিক মানুষেরাও এমন অনেক কাজ করতে থাকেন যা শরীয়তসঙ্গত নয় এবং ইসলামের প্রথম যুগে কোনো ধার্মিক মানুষের কাজ ছিল না। যেমন তৎকালীন সময়ে সূফীদের মধ্যে 'সামা' বা গান বাজনার প্রসারের একটি উদাহরণের মাধ্যমে এই অবস্থা ব্যাখ্যা করতে চাই; কারণ মীলাদ অনুষ্ঠানের কর্মকাণ্ড বুঝতে তা আমাদের সাহায্য করবে।

ইসলামের প্রথম যুগসমূহ 'সামা' বা শ্রবণ বলতে শুধুমাত্র কুরআন শ্রবণ ও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনী, কর্ম ও বাণী শ্রবণকেই বুঝান হতো। এগুলোই তাদের মনে আল্লাহর ভালোবাসা ও নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভালোবাসার জোয়ার সৃষ্টি করত। কোনো মুসলিম কখনই আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের জন্য বা হৃদয়ে আল্লাহর ভালোবাসা তৈরির দোহাই দিয়ে গান শুনতো না। সমাজের বিলাসী বা অধার্মিক মানুষদের মধ্যে বিনোদন হিসেবে গান-বাজনার প্রচলন ছিল, কিন্তু আলেমগণ তা হারাম জানতেন। কখনই এ সকল কর্ম আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের মাধ্যম বলে গণ্য হয়নি। তারা সকলেই মূলত কুরআন-সুন্নাহর গভীর জ্ঞান অর্জন করা ও অর্জিত জ্ঞানের আলোকে জীবন পরিচালনার ওপর গুরুত্ব প্রদান করতেন।[৩৬]

কিন্তু পরবর্তীকালে মুসলিম বিশ্বের সার্বিক অস্থিরতা, ফিকহ, হাদীস ও অন্যান্য ইসলামী জ্ঞান চর্চার অভাব, বিজাতীয় প্রভাব ইত্যাদি কারণে কিছু কিছু মানুষের মধ্যে বিভিন্ন অনাচার প্রবেশ করে। এদের মধ্যে ক্রমে ক্রমে

৩৬. যাহাবী, নুবালা (১৪/৬৬-৭০)।

গান-বাজনা, নর্তন-কুর্দন ইত্যাদি অনাচার ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। গান-বাজনা এক পর্যায়ে ধার্মিক মানুষদের ধর্ম-কর্মের অংশ হয়ে যায়। তারা একে 'সামা' বা শ্রবণ বলতেন। তারা গানের তালে তালে নাচতে থাকতেন এবং অনেকেই আবেগে নিজের পরিধেয় কাপড় চোপড় ছিড়ে ফেলতেন। কেউ বাজনাসহ, কেউবা বাজনা ব্যতিরেকে গান গেয়ে ও নেচে নিয়মিত 'সামা'র মজলিস করতেন। কারণ তাদের ধারণা ছিল যে, এ সকল গান-গজল আল্লাহভক্তদের মনে আল্লাহর ভালোবাসার জোয়ার সৃষ্টি করত। তারা 'সামা'কে আল্লাহপ্রাপ্তির ও আল্লাহপ্রীতি অর্জনের অন্যতম মাধ্যম মনে করতেন। আর এটা জানা কথা যে, সমাজে যখন কোনো কাজ ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়ে যায়, বিশেষত ধার্মিক ও ভালো মানুষদের মধ্যে, তখন অনেক আলেম এ সকল কর্মের পক্ষে বিভিন্ন যুক্তি প্রদান করেন এবং এগুলোকে জায়েয বা ইসলামসম্মত বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন। গান-বাজনার ক্ষেত্রেও এই অবস্থা হয়। কোনো কোনো আলেম সূফীদের প্রতি সম্মান হেতু এবং হৃদয়ে গানের ফলে যে আল্লাহর ভালোবাসার তথাকথিত আবেশ ও আনন্দ পাওয়া যায় তার দিকে লক্ষ্য করে এগুলোর পক্ষে মিথ্যা ওকালতি করেছেন। যেমন, প্রখ্যাত দার্শনিক গাযালী (৫০৫ হি.)। তিনি তার সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'এহইয়াউ উলুমিদ্দীন' গ্রন্থে সুদীর্ঘ আলোচনার মাধ্যমে গান-বাজন ও নর্তন-কুর্দনের পক্ষে যুক্তি প্রমান পেশ করার চেষ্টা করেছেন। তবে তিনি স্বীকার করেছেন যে, এ সকল কর্ম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ ও সাহাবী, তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীদের যুগে প্রচলিত বা পরিচিত ছিল না।[৩৭]

---

৩৭. আবু হামিদ আল-গাযালী, এহইয়াউ উলূমিদ্দীন (বৈরুত: দারুল ফিকর, ১৯৯৪ খ্রি.) ২/২৯২-৩৩২।

অপরদিকে সত্যনিষ্ঠ আলেম সমাজের বহুল প্রচলনকে মেনে নিতে পারেননি। তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ ও সাহাবী, তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীদের যুগকেই প্রামাণ্য বলে মনে করেছেন, এ সকল যুগে যেহেতু গান-বাজনা, নর্তন-কুর্দন ইত্যাদি কখনই আল্লাহর পথের পথিকদের কর্ম ছিল না, বরং সমাজের পাপী অশ্লীলতায় লিপ্ত লোকেদের কর্ম ছিল, তাই সূফী ও জাহেলদের মধ্যে বহুল প্রচলন সত্ত্বেও তারা এগুলোকে মেনে নেননি, বরং তা রোধ করার চেষ্টা করেছেন। তবে পূর্বোক্ত ইসলামী বিশ্বের সার্বিক অবস্থা সামনে নিলে সে যুগের আলেমদের সংস্কারমূলক কাজের সীমাবদ্ধতা আমরা সহজেই বুঝতে পারি। তারা রাষ্ট্রীয় সমর্থন থেকে বঞ্চিত ছিলেন। সমাজে অজ্ঞতার প্রভাব ছিল বেশি। তা সত্ত্বেও তারা সেই যুগে ইসলামের আলোর মশাল জ্বালিয়ে রেখেছেন, সমাজের মানুষদেরকে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা প্রদানের চেষ্টা করেছেন। তারাই ছিলেন দীনের সঠিক মশাল। আল্লাহ তাদেরকে রহমত করুন।

খ. প্রবর্তক: ব্যক্তি ও জীবন

আগেই বলেছি যে, মিশরের শিয়া শাসকরা প্রথম ঈদে মীলাদুন্নবীর প্রবর্তন করে। ৬ষ্ঠ হিজরী শতকের শেষ দিকে মিশরের বাইরেও কোনো কোনো ধর্মপ্রাণ মানুষ ব্যক্তিগত পর্যায়ে প্রতি বৎসর রবিউল আউয়াল মাসের প্রথম দিকে ঈদে মীলাদুন্নবী পালন করতে শুরু করেন। তবে ইরবিলের শাসক আবু সাঈদ কুকবূরীর মাধ্যমেই এই উৎসবকে সুন্নী জগতে এবং সমগ্র মুসলিম বিশ্বে জনপ্রিয় উৎসবে পরিণত হয়। এজন্য বিভিন্ন সীরাতুন্নবী বিশেষজ্ঞ ও ঐতিহাসিকগণ তাকেই ঈদে মীলাদুন্নবীর প্রবর্তক হিসেবে উল্লেখ করেছেন; কারণ তিনিই প্রথম এই উৎসবকে বৃহৎ আকারে পালন করতে শুরু করেন এবং সাধারণের মধ্যে এই উৎসবের প্রচলন ঘটান। আল্লামা মুহাম্মাদ ইবন ইউসূফ সালেহী শামী (মৃত্যু ৯৪২ হি., ১৫৩৬ খ্রি.)

তার প্রখ্যাত সীরাতুন্নবী গ্রন্থে- (সীরাহ শামীয়া) ঈদে মীলাদুন্নবী পালনের আহ্বান জানাতে গিয়ে আলোচনার প্রথম দিকে লিখছেন: "সর্বপ্রথম যে বাদশাহ এই উৎসব উদ্ভাবন করেন তিনি হলেন, ইরবিলের শাসক আবু সাঈদ কুকবূরী...।"[৩৮]

আল্লামা যাহাবী রাহিমাহুল্লাহ কুকবূরীর পরিচিতি প্রদান করতে গিয়ে লিখছেন: "ধার্মিক সুলতান সম্মানিত বাদশাহ মুযাফফরুদ্দীন আবু সাঈদ কুকবূরী ইবন আলী ইবন বাকতাকীন ইবন মুহাম্মাদ আল-তুরকমানী।"[৩৯] তারা তুর্কী বংশোদ্ভুত। তার নামটিও তুর্কী। তুর্কী ভাষায় কুকবূরী শব্দের অর্থ 'নীল নেকড়ে'।[৪০]

তার পিতা আলী ইবন বাকতাকীন ছিলেন ইরাকের ইরবিল অঞ্চলের শাসক। তিনি অত্যন্ত সাহসী ও বীর যোদ্ধা ছিলেন। ক্রুসেড যোদ্ধাদের থেকে অনেক এলাকা জয় করে তার শাসনাধীনে নিয়ে আসেন। তিনি ধার্মিকতার জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। অনেক মাদ্রাসা ও জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান তিনি প্রতিষ্ঠা করেন।

বীরত্ব ও ধার্মিকতার এই পরিবেশে কুকবূরী ৫৪৯ হিজরী সনে (১১৫৪ খ্রি.) জন্মগ্রহণ করেণ।[৪১] তার বয়স যখন মাত্র ১৪ বছর তখন ৫৬৩ হিজরী সনে (১১৬৮ খ্রি.) তার পিতা মারা যান।[৪২] পিতার মৃত্যুর পরে কুকবূরী

---

৩৮. আস-সালেহী, সীরাত, প্রাগুক্ত (১/৩৬২)।

৩৯. যাহাবী, নুবালা', প্রাগুক্ত (২২/৩৩৪)।

৪০. ইবনে খাল্লিকান, ওয়াইয়াতুল আ'ইয়ান, প্রাগুক্ত (৪/১২১)।

৪১. যিরিকলী, মুহম্মদ খাইরুদ্দীন, আল-আ'লাম, প্রাগুক্ত (৫/২২৭)।

৪২. যাহাবী, নুবালা, প্রাগুক্ত (২২/৩২৫); আল-ই'বার, প্রাগুক্ত (৩/৪০), পৃ. ২০৮।

ইরবিলের শাসনভার গ্রহণ করেন।[৪৩] তিনি অল্পবয়স্ক হওয়ার কারণে আতাবিক মুজাহিদ উদ্দীন কায়মায তার অভিভাবক হিসেবে নিযুক্ত হন।[৪৪] উক্ত অভিভাবক কিছুদিনের মধ্যেই কুকুবুরীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন এবং কুকুবুরীকে শাসনকার্য পরিচালনায় অযোগ্যতার অভিযোগে ক্ষমতাচ্যুত করে তার ভাই ইউসুফকে ক্ষমতায় বসান।[৪৫] কুকবূরী তখন ইরবিল ত্যাগ করে ইরাকের মাওসিল অঞ্চলের শাসক সাইফুদ্দীন গাযী ইবন মাউদূদের নিকট গমন করেন। তিনি কুকবূরীকে মাউসিলের শাসনাধীন হাররান অঞ্চলের শাসক হিসেবে নিয়োগ করেন।[৪৬] কিছুদিন হাররানে অবস্থান করার পরে তিনি যে যুগের প্রসিদ্ধ বীর, মিসর ও সিরিয়ার শাসক গাজী সালাহুদ্দীন আইয়ুবীর দরবারে যোগ দেন। তিনি সালাহুদ্দীনের সাথে বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। সালাহুদ্দীন কুকবূরীর বীরত্বে ও কর্তব্যনিষ্ঠায় এতই মুগ্ধ হন যে, তিনি তার বোন রাবীয়া খাতুনের সাথে কুকবূরীর বিবাহ দেন এবং তাকে হাররান ও রুহা অঞ্চলের শাসক নিযুক্ত করেন।[৪৭] ৫৮৩ হিজরীতে (১১৮৭ খ্রি.) হিত্তীনের যুদ্ধে সালাহুদ্দীন আইয়ুবীর মুসলিম বাহিনী সম্মিলিত খ্রিস্টান ক্রুসেড বাহিনীকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে এবং জেরুজালেম ও সমগ্র প্যালেস্টাইন থেকে ইউরোপীয় বাহিনীর চূড়ান্ত পরাজয়ের সূচনা করে।[৪৮] এই যুদ্ধে কুকবূরী অতুলনীয় বীরত্ব প্রদর্শন

---

৪৩. যাহাবী, আল-ই‘বার, প্রাগুক্ত (৩/২০৮)।

৪৪. যাহাবী, নুবালা, প্রাগুক্ত (২২/৩৩৫)।

৪৫. প্রাগুক্ত।

৪৬ প্রাগুক্ত।

৪৭. প্রাগুক্ত। সালাহুদ্দীন আইয়ুবীরা ছয় ভাই ও দুই বোন ছিলেন। যাহবী, আল-ইবার, প্রাগুক্ত (৩/৫৪)।

৪৮. যাহাবী, আল-ইবার, প্রাগুক্ত (৩/৮৫); ইবন কাসীর, আল-বিদায়া, প্রাগুক্ত (৮/৪৭০-৪৭৩); মাহমূদ শাকির, আত-তারীখুল ইসলামী, প্রাগুক্ত (৬/৩৩২)।

করেন। এ সময়ে তার ভাই ইরবিলের শাসক ইউসুফ মারা যান। তখন সালাহুদ্দীন কুকবূরীকে পুনরায় ইরবিলের শাসন ক্ষমতা প্রদান করেন।[৪৯]

কুকবূরী অত্যন্ত ধার্মিক ছিলেন। পরবর্তী শতাব্দীর প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ইমাম যাহাবী (মৃত্যু ৭৪৮ হি.) বলেন, "যদিও তিনি (কুকবূরী) একটি ছোট্ট রাজ্যের রাজা ছিলেন, তিনি ছিলেন সবচেয়ে বেশি ধার্মিক, সবচেয়ে বেশি দানশীল, সমাজকল্যাণে ব্রত ও মানবসেবী বাদশাহদের অন্যতম। প্রতি বছর ঈদে মীলাদুন্নবী উদযাপনের জন্য তিনি যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতেন তা সবার মুখে প্রবাদের মতো উচ্চারিত হতো।'[৫০] তিনি শাসনকার্য পরিচালনার ফাঁকে ফাঁকে আলেমদের নিকট থেকে জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা করতেন।[৫১]

আবু সাঈদ কুকবূরীর সমসাময়িক ঐতিহাসিক আল্লামা ইয়াকুত আল-হামাবী (মৃত্যু ৬২৬ হি.) কুকবূরীর বর্ণনা দিকে গিয়ে লিখেছেন: "আমীর মুযাফফরুদ্দীন কুকবূরী এই ইরবিল শহরের উন্নয়নমূলক প্রভুত কর্ম করেন। এই আমীরের চরিত্র বৈপরিত্যময়। একদিকে তিনি প্রজাদের ওপর অনেক যুলুম অত্যাচার করেন, অবৈধভাবে প্রজাদের নিকট থেকে সম্পদ সংগ্রহ করেন। অপরদিকে তিনি কুরআন পাঠক ও ধার্মিক মানুষদের সাহায্য করেন, দরিদ্র ও অসহায়দের জন্য তার দানের হাত খুবই প্রশস্ত।

৪৯. যাহাবী, নুবালা, প্রাগুক্ত (২২/৩৩৫); আল-ইবার, প্রাগুক্ত (৩/২০৮)।

৫০. যাহাবী, প্রাগুক্ত (৩/২০৮)।

৫১. আল-যিরিকলী, আ'লাম, প্রাগুক্ত (৫/২৩৭)।

কল্যাণকর্মে তিনি মুক্তহস্তে ব্যয় করেন, অমুসলিমদের নিকট বন্দী মুসলিমদেরকে টাকার বিনিময়ে মুক্ত করেন...।"[৫২]

কর্মময় জীবনের সমাপ্তি ঘটিয়ে প্রায় ৮২ বছর বয়সে কুকবূরী ৬৩০ হিজরীর ৪ রমাদ্বান (১৩-০৬-১২৩৩ খ্রি.) মারা যান।[৫৩] তার সুদীর্ঘ কর্মময় জীবনের অন্যতম কর্ম যা তাকে সমসাময়িক সকল শাসক থেকে পৃথক করে রেখেছে এবং ইতিহাসে তাকে বিশেষভাবে স্মরণীয় করে রেখেছে তা হলো ঈদে মীলাদুন্নবী উদযাপনের প্রচলন। তিনি ৫৮৩ থেকে ৬৩০ পর্যন্ত দীর্ঘ প্রায় ৪৫ বৎসরের শাসনামলের কোন বছরে প্রথম এই অনুষ্ঠান শুরু করেন তা সঠিকভাবে জানতে পারেনি। প্রখ্যাত বাঙ্গালী আলেমে দীন, মাওলানা মুহাম্মাদ বেশারতুল্লাহ মেদিনীপুরী উল্লেখ করেছেন যে, হিজরী ৬০৪ সাল থেকে কুকবূরী মীলাদ উদযাপন শুরু করেন।[৫৪] তিনি তার এই তথ্যের কোনো সূত্র প্রদান করেননি। ঐতিহাসিকদের বর্ণনা থেকে প্রতিয়মান হয় যে, ৬০৪ হিজরীর আগেই কুকবূরী মীলাদ উদযাপন শুরু করেন। ইবন খাল্লিকান লিখেছেন: "৬০৪ হিজরীতে ইবন দেহিয়া খোরাসান যাওয়ার পথে ইরবিলে আসেন। সেখানে তিনি দেখেন যে, বাদশাহ মুযাফফরুদ্দীন কুকবূরী অতীব আগ্রহ ও উদ্দীপনার সাথে মীলাদ উদযাপন

---

৫২. ইয়াকুত আল-হামাবী, মু'জামুল বুলদান (বৈরুত: দারু এহইয়াইত তুরাস আল-আরাবী, ১৯৭৯ খ্রি.) ১/১৩৮।

৫৩. যাহাবী, আল-ইবার (৩/২০৮); নুবালা (২২/৩৩৭); ইবন কাসীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (৯/১৮)।

৫৪. মুহাম্মাদ বেশারাতুল্লাহ, হাকীকতে মুহাম্মাদী ও মীলাদে আহমাদী (পার্বত্য চট্টগ্রাম, মুহাম্মাদ মুশতাকুর রহমান, ১ম সংস্করণ), পৃ. ৩০১-৩০২।

করেন এবং এ উপলক্ষে বিশাল উৎসব করেন। তখন তিনি তার জন্য এ বিষয়ে একটি গ্রন্থ রচনা করেন...।”[৫৫]

এ থেকে স্পষ্ট যে, ইবন দেহিয়া ৬০৪ হিজরীতে ইরবিলে আগমনের কিছু পূর্বেই কুকবূরী মীলাদ উদযাপন শুরু করেন, এজন্যই ইবন দেহিয়া ইরবিলে এসে তাকে এই অনুষ্ঠান উদযাপন করতে দেখতে পান। তবে উদযাপনটি ৬০৪ হিজরীর বেশি আগে শুরু হয়নি বলেই মনে হয়; কারণ বিষয়টি ইবন দেহিয়া আগে জানতেন না, এতে বুঝা যায় তখনো তা পার্শবর্তী দেশগুলোতে প্রসিদ্ধি লাভ করেনি। এতে আমরা অনুমান করতে পারি যে, কুকবূরী ৬ষ্ঠ হিজরী শতকের শেষ দিকে বা ৭ম হিজরী শতকের শুরুতে (৫৯৫-৬০৩ হিজরী) মীলাদ পালন শুরু করেন।

গ. প্রথম মীলাদ গ্রন্থ লেখক: ব্যক্তি ও জীবন

মীলাদ অনুষ্ঠান প্রচলন করার ক্ষেত্রে আরেক ব্যক্তিত্বের অবদান আলোচনা না করলে সম্ভবত আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। তিনি হলেন ‘মীলাদুন্নবী’র উপরে সর্বপ্রথম গ্রন্থ প্রণেতা আল্লামা আবুল খাত্তাব ওমর ইবন হাসান, ইবন দেহিয়া আল-কালবী (৬৩৩ হি.), যার গ্রন্থ পরবর্তীতে ‘মীলাদ’ কেন্দ্রিক অসংখ্য গ্রন্থ রচনার উৎস ছিল। মীলাদের ওপর লিখিত গ্রন্থের জন্য কুকবূরী তাকে এক হাজার দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) পুরস্কার প্রদান করেন।[৫৬]

ইবন দেহিয়া ৫৪৪ হিজরীতে (১১৫০ খ্রি.) জন্মগ্রহণ করেন এবং ৬৩৩ হিজরীতে (১২৩৫ খ্রি.) মিশরে মারা যান। প্রায় ৯০ বছরের জীবনে তিনি

৫৫. ইবন খাল্লিকান (৩/৪৪৯)। আরো দেখুন: (১/২১১), (৪/১১৯)।

৫৬. যাহাবী, নুবালা (২২/৩৩৬); আস-সালেহী, সীরাত (১/৩৬২); ইবন কাসীর, আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া (৯/২৬)।

তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের প্রায় সর্বত্র ভ্রমণ করেন। তিনি বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা করেন এবং ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানে তার অবদান রাখেন। তবে লক্ষ্যণীয় যে ঈদে মীলাদুন্নবীর প্রথম পুস্তক লেখক ইবন দেহিয়া সমসাময়িক বা পরবর্তী আলেম ও লেখকদের প্রশংসা অর্জন করতে পারেননি। বরং সকল ঐতিহাসিক ও লেখক তার কর্মময় জীবনের বর্ণনার পাশাপাশি তার কিছু কিছু আচরণ ও কর্মের সমালোচনা করেছেন।

আল্লামা জিয়াউদ্দীন মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল ওয়াহেদ আল-মাকদেসী (৫৬৯-৬৪৩ হি.) বলেছেন: "আমি ইস্পাহানে তাকে দেখেছি। তবে তার থেকে কিছু শিক্ষা গ্রহণ করিনি। কারণ তার অবস্থা আমার ভালো লাগেনি। তিনি ইমামদের খুবই নিন্দা-মন্দ করতেন।"[৫৭] আল্লামা যাহাবী লিখেছেন: "তিনি বিভিন্ন ইসলামীশাস্ত্রে পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন, আরবী ভাষা ও হাদীসশাস্ত্রে তিনি বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন, তবে তিনি হাদীস বর্ণনাকারী হিসেবে দ্বঈফ বা দুর্বল ছিলেন।"[৫৮] তার এই স্বভাবের কারণে তিনি যখন মরক্কো ও তিউনিসিয়া অঞ্চলে অবস্থান করছিলেন তখন সে দেশের আলেমগণ একত্রে তার বিরুদ্ধে, তাকে অগ্রহণযোগ্য ঘোষণা দিয়ে একটি ঘোষণাপত্র লিখেন।[৫৯]

ঐতিহাসিক আল্লামা মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল গনী, ইবন নুকতা (৬২৯ হি.) লিখেছেন: "তিনি বড় জ্ঞানী ও মর্যাদার অধিকারী হিসেবে সমাজে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু তিনি নিজের বিষয়ে এমন অনেক বিষয় দাবি করতেন যা ছিল একেবারেই অবাস্তব। তিনি দাবি করতেন যে, সহীহ মুসলিম ও

---

৫৭. যাহাবী, নুবালা (২২/৩৯১)।

৫৮. যাহাবী, নুবালা (২২/৩৯১)।

৫৯. যাহাবী, নুবালা (২২/৩৯১)। মীযানুল ই'তিদাল (৩/১৮৬)।

সুনানে তিরমিযী তার মুখস্ত রয়েছে। একজন ছাত্র পরীক্ষামূলক সহীহ মুসলিমের কয়েকটি হাদীস, সুনানে তিরমিযীর কয়েকটি হাদীস ও কয়েকটি বানোয়াট বা মাওদু‘ হাদীস একত্রে লিখে তাকে দেন। তিনি হাদীসগুলো পৃথক করতে বা কোনটি কোন কিতাবের হাদীস তা জানাতে পারেননি।”[৬০]

আল্লামা যাহাবী বলেন, “তার গ্রন্থাবলির মধ্যে সহীহ ও দ্বঈফ বর্ণনার ক্ষেত্রে এমন কিছু বিষয় রয়েছে যা খুবই আপত্তিকর।”[৬১]

আল্লামা ইবন হাজার আসকালানী (৮৫২ হি.) ঐতিহাসিক ইবন নাজ্জার (৬৪৩ হি.) থেকে বর্ণনা করেছেন: “আমরা দেখেছি, সকল মানুষ একমত ছিলেন যে, ইবন দেহিয়া মিথ্যা কথা বলেন এবং বিভিন্ন অসত্য দাবি করেন।”[৬২]

ইবন হাজার আসকালানী অন্য এক বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন: “তার সমসাময়িক এক আলেম বলেন, একদিন আমি সুলতানের দরবারে ছিলাম, যেখানে ইবন দেহিয়াও ছিলেন। সুলতান আমাকে একটি হাদীস জিজ্ঞেস করলে আমি হাদীসটি বলি। তখন তিনি আমাকে হাদীসটির সনদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। আমি তখন হাদীসটির সনদ মনে করতে পারি না এবং আমার অপারগতা জানাই। পরে আমি দরবার ত্যাগ করলে ইবন দেহিয়া আমার সাথে আসেন এবং বলেন, যখন সুলতান আপনাকে সনদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন তখন যেকোনো একটি বানোয়াট সনদ বলে দিলে

---

৬০. যাহাবী, নুবালা (২২/৩৯২)। আরো দেখুন: সুয়ূতী, জালালুদ্দীন আব্দুর রহমান, তাবাকাতুল হুফ্ফায (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, ১৯৮৩ খ্রি.), পৃ. ৫০১।

৬১. মীযানুল ই‘তিদাল (৩/১৮৮)।

৬২. ইবনে হাজার, লিসানুল মীযান (বৈরুত: দারুল ফিকর, ২য় সংস্করণ) ৪/২৯৫।

আপনার কি ক্ষতি হতো? সুলতান ও তার দরবারের সবাই জাহেল, তারা কিছুই বুঝতে পারত না। তাতে আপনাকে 'জানি না' বলতে হতো না এবং উপস্থিত সভাসদদের কাছে আপনার মর্যাদা বৃদ্ধি পেত। উক্ত আলেম বলেন, ইবন দেহিয়ার এই কথায় আমি বুঝতে পারলাম তিনি মিথ্যা বলতে পরোয়া করেন না।'[৬৩]

ইবন হাজার আসকালানী অন্য একজন সমসাময়িক আলেমের উদ্ধৃতি দিয়ে উল্লেখ করেছেন: "ইবনে দেহিয়া যখন ইস্পাহানে আসলেন তখন আমার পিতার খানকায় আসতেন। আমার আববা তাকে খুবই সম্মান করতেন। একদিন তিনি আমার আব্বার কাছে একটি জায়নামাজ নিয়ে এসে তার সামনে রেখে বলেন, এই জায়নামাজে আমি এত এত হাজার রাকাত সালাত আদায় করেছি এবং আমি কা'বা শরীফের মধ্যে এই জায়নামাজে বসে কয়েকবার কুরআন মাজীদ খতম করেছি। আমার আব্বা খুবই খুশী হয়ে জায়নামাজটি গ্রহণ করেন এবং মাথায় রাখেন ও চুমু খেতে থাকেন। তিনি এই হাদিয়া পেয়ে খুবই খুশি হন। এ দিকে কাকতালীয়ভাবে সন্ধ্যার দিকে একজন স্পাহানী স্থানীয় ব্যক্তি আমাদের কাছে আসেন। তিনি কথা প্রসঙ্গে বলেন, আপনাদের খানকায় যে মরোক্কীয় আলেম আসেন তাকে দেখলাম বাজার থেকে অনেক দামে একটি খুব সুন্দর জায়নামাজ কিনলেন। তখন আমার আববা (একটু খটকা লাগায়) ইবন দেহিয়ার প্রদত্ত জায়নামাজটি আনতে বলেন। জায়নামাজটি দেখে ঐ ব্যক্তি কসম করে বলে যে, সে এই জায়নামাজটিই কিনতে দেখেছে ইবন দেহিয়াকে। এতে

৬৩. ইবন হাজার, লিসানুল মীযান (৪/২৯৫)।

আমার আব্বা চুপ হয়ে যান এবং আমাদের মন থেকে ইবন দেহিয়ার প্রতি সকল সম্মান চলে যায়।"[৬৪]

আল্লামা ইবন কাসীর (৭৭৪ হি.) লিখেছেন: "ইবনে দেহিয়া সম্পর্কে অনেকে অনেক কিছু বলেছেন। বলা হয় তিনি মাগরিবের সালাত কসর করার বিষয়ে একটি মিথ্যা হাদীস বানিয়ে বলেছেন। আমার ইচ্ছা ছিল হাদীসটির সনদ দেখব; কারণ সকল মুসলিম আলেম একমত যে, মাগরীবের সালাত কসর হয় না... আল্লাহ আমাদেরকে এবং তাকে দয়া করে ক্ষমা করে দিন।"[৬৫]

ইবন দেহিয়ার মিথ্যাচার সম্পর্কে একটি বিবরণ প্রদান করেছেন সমসাময়িক ঐতিহাসিক ইবন খাল্লিকান (৬৮১ হি.)। ইবন দেহিয়ার প্রতি তার অগাধ আস্থা ও শ্রদ্ধা ছিল বলে তাঁর লেখা থেকে প্রতীয়মান হয়। তাঁর লেখা মীলাদের বইটি তিনি ৬২৫ হিজরীতে কুকবূরীর দরবারে বসে পড়তে পেরে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করতেন।[৬৬] কিন্তু তিনি আশ্চার্য্য হন যে, উক্ত বইয়ের শেষে ইবন দেহিয়া একটি বড় আরবী কাসীদা লিখেছেন কুকবূরীর প্রশংসায়। তিনি দাবি করেছেন যে, কাসীদাটি তিনি নিজে লিখেছেন। কিন্তু পরবর্তীকালে ইবন খাল্লিকান জানতে পারেন যে, কবিতাটি সিরিয়ার হালাব শহরের বাসিন্দা কবি আস'আদ ইবন মামাতীর (মৃত্যু ৬০৬ হি.) লেখা ও তার কাব্য গ্রন্থে সংকলিত, তিনি উক্ত কাসীদা দ্বারা তৎকালীন অন্য একজন শাসকের প্রশংসা করেন।[৬৭]

---

৬৪. ইবন হাজার, লিসানুল মীযান (৪/২৯৬)।

৬৫. ইবন কাসীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (৯/২৬)।

৬৬. ইবন খাল্লিকান, প্রাগুক্ত (১/২১২), (৩/৪৪৯-৪৫০)।

৬৭. ইবন খাল্লিকান, প্রাগুক্ত (১/২১১-২১২), (৩/৪৫০)।

সবকিছুর মধ্য দিয়ে আমরা বলতে পারি যে, ইবন দেহিয়া যে যগের একজন বিদ্বান ব্যক্তি ছিলেন। যে গ্রন্থটি তাকে ইতিহাসের পাতায় স্থান করে দিয়েছে তা হলো 'মীলাদুন্নবী' বা রাসূলুল্লাহর জন্ম বিষয়ে লেখা তার বই 'আত-তানবীর ফী মাওলিদিল বাশীর আন-নাযির'। কারণ এটিই ছিল 'মীলাদুন্নবী' বা রাসূলুল্লাহর জন্ম বিষয়ে লেখা প্রথম বই। ইবন খাল্লিকানের বর্ণনা অনুসারে আমরা দেখতে পাই, ইবন দেহিয়া ৬০৪ হিজরীতে ইরবিলে প্রবেশ করেন। তিনি বছর দুয়েক সেখানে বাদশাহ কুকবূরীর রাষ্ট্রীয় মেহমান হিসেবে অবস্থান করেন। এ সময়ে তিনি এই বইটি সংকলন করেন। ৬০৬ হিজরীতে তিনি এই বইটি লেখা সমাপ্ত হলে তা কুকবূরীকে পড়ে শোনান।[৬৮]

এখানে আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ, তাবেয়ীগণ বা তৎপরবর্তী মুসলিম সমাজের আলেমগণ ৬০০ বছর যাবৎ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মকে কেন্দ্র করে কি একটি বইও লিখেননি?

এ প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে আমাদেরকে সেই যুগসমূহের অবস্থা বুঝতে হবে। প্রথম যুগের মুসলিমগণ, সাহাবী ও তাবেয়ীগণের সার্বক্ষণিক কর্ম ও ব্যস্ততা ছিল মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে। তাদের সকল আবেগ, ভালোবাসা ও ভক্তি দিয়ে তারা মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন ও কর্ম জানতে, বুঝতে, শেখাতে ও লিপিবদ্ধ করতে চেয়েছেন। তাদের কর্মকাণ্ডের যে বর্ণনা হাদীসে ও ইতিহাসে লিপিবদ্ধ রয়েছে এবং তাদের যুগে লিখিত ও সংকলিত যে সকল বই-পুস্তকের বর্ণনা আমরা পাই বা যে সকল বই পুস্তক বর্তমান যুগ পর্যন্ত

৬৮. ইবন খাল্লিকান, প্রাগুক্ত (১/২১২), (৩/২৯), (৪/১১৯)।

টিকে আছে তার আলোকে আমরা দেখতে পাই যে, তারা মূলত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কর্ম, চরিত্র, ব্যবহার, আকৃতি, প্রকৃতি, জীবন পদ্ধতি জানতে-বুঝতে ব্যস্ত ছিলেন, তার জীবনী সংকলনের দিকে যে যুগের মুসলিমদের মনোযোগ দেখা যায় না। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের অনুকরণীয়, অনুসরণীয় ও তাঁর প্রবর্তিত বিধানাবলির দিকটায় তারা গুরুত্ব দিয়েছেন, তার জীবনের ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা, বা জীবনী রচনার দিকে তারা গুরুত্ব প্রদান করেননি। ফলে আমরা দেখতে পাই যে, সাহাবীগণের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মদিন, জন্ম তারিখ বা জন্মমাস নিয়ে কোনো আলোচনাই পাওয়া যায় না। স্বভাবতই তার জন্ম কেন্দ্রিক কোনো গ্রন্থও তখন রচিত হয়নি। প্রথম তিন শতাব্দীতে রচিত হাদীস গ্রন্থসমূহে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্ম সংক্রান্ত যৎ সামান্য কয়েকটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে, যা আগে আলোচনা করেছি। এছাড়া প্রথম শতাব্দীর শেষ থেকে সীরাতুন্নাবী বা নবী জীবনী বিষয়ক গ্রন্থ লেখা হতে থাকে বলে মনে হয়। তবে এ যুগে মূলত সীরাতুন্নাবীর মাগাযী বা যুদ্ধবিগ্রহ বিষয়ক বিষয়েই বিশেষভাবে লিখা হত।[৬৯] দ্বিতীয় ও তৃতীয় হিজরী শতকের উল্লেখযোগ্য সীরাতুন্নবী গ্রন্থ হলো মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক (মৃত্যু ১৫১ হি./৭৬৮খ্রি.), আব্দুল মালেক ইবন হিশাম (মৃত্যু ২১৮ হি./৮৩৪ খ্রি.), মুহাম্মাদ ইবন সা'দ (২৩০ হি./৮৪৫ খ্রি.) প্রমুখের লিখা 'সীরাতুন্নবী গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য। এ সকল গ্রন্থে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মসংক্রান্ত কিছু বর্ণনা পাওয়া যায়। এছাড়া তৃতীয় হিজরী শতক থেকে মুসলিম ঐতিহাসিকগণ লিখিত সকল ইতিহাস গ্রন্থে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি

৬৯. ফুয়াদ সিযকিন, তারিখুল তুরাস আল আরাবী (সৌদি আরব, রিয়াদ: আল-ইমাম বিশ্ববিদ্যালয়, ১ম সংস্করণ, ১৯৮৩ খ্রি.), ১ম খণ্ড, ২য় অংশ, পৃ. ৬৫-৮৬।

ওয়াসাল্লামের জন্মসংক্রান্ত বর্ণনা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। যেমন খলীফা ইবন খাইয়াত 'শাবাব' আল উসফুরী (২৪০হি./৮৫৪খ্রি:), আহমদ ইবন ইয়হইয়া আল-বালাযুরী (২৭৯হি./৮৯২খ্রি.), আল্লামা মুহাম্মাদ ইবন জরীর (৩১০হি./৯২৩খ্রি.) ও অন্যান্য ঐতিহাসিকদের লিখিত ইতিহাস গ্রন্থ। পঞ্চম হিজরী শতক থেকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কতৃক সংঘটিত মুজিযা বা অলৌকিক ঘটনাবলি পৃথকভাবে সংকলিত করে 'দালাইলুন নুবুওয়াত' নামে কয়েকটি গ্রন্থ লেখা হয়, যেমন আবু নু'আইম আহমদ ইবন আব্দুল্লাহ আল-আসফাহানী (৪৩০হি./১০৩৯খ্রি.) ও আবু বকর আহমদ ইবন হুসাইন আল-বাইহাকী (৪৫৮ হি./১০৬৬ খ্রি.) সংকলিত 'দালাইলুন নুবুওয়াত' গ্রন্থ। এ সকল গ্রন্থে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মকালীন অলৌকিক ঘটনাবলির কিছু বর্ণনা পাওয়া যায়। সর্বাবস্থায় আমরা দেখতে পাই যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মকে নিয়ে পৃথক গ্রন্থ কেউ-ই রচনা করেননি। বস্তুত তার জন্ম উদযাপন যেমন ইসলামের প্রথম শতাব্দীগুলোতে মুসলিম উম্মাহর অজানা ছিল, তেমনি তার জন্ম বা 'মীলাদ' নিয়ে পৃথক গ্রন্থও ৬ষ্ঠ শতাব্দীর আগে কেউ রচনা করেননি। কারণ তাদের কাছে জন্ম বৃত্তান্ত বড় কোনো বিষয় বলে বিবেচিত হতো না।

উপসংহার:

এভাবে আমরা দেখতে পাই যে, মিশরের ইসমাঈলীয় শাসকগণ দ্বারা প্রবর্তিত হলেও ঈদে মীলাদুন্নবী উদযাপনকে সমস্ত মুসলিম বিশ্বে অন্যতম উৎসবে পরিণত করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় অবদান ইবরিলের শাসক আবু সাঈদ কুকবূরীর। তাকেই আমরা মীলাদ অনুষ্ঠানের প্রকৃত প্রবর্তক বলে মনে করতে পারি। এর অন্যতম প্রমাণ হলো ৪র্থ হিজরী শতকে মিশরে এই উদযাপন শুরু হলে তার কোনো প্রভাব বাইরের মুসলিম

সমাজগুলোতে পড়েনি। এমনকি পরবতী ২০০ বছরের মধ্যেও আমরা মুসলিম বিশ্বের অন্য কোথাও এই উৎসব পালন করতে দেখতে পাই না। অথচ ৭ম হিজরী শতকের শুরুতে কুকবূরী ইরবিলে ঈদে মীলাদুন্নবী উদযাপন শুরু করলে তা তৎকালীন মুসলিম সমাজগুলোতে সাড়া জাগায়। পরবর্তী ২০০ বছরের মধ্যে এশিয়া-আফ্রিকার বিভিন্ন মুসলিম সমাজে অনেক মানুষ ঈদে মীলাদুন্নবী পালন করতে শুরু করে।

যে সকল কর্ম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে, সাহাবী, তাবেয়ী ও তাবে তাবেয়ীদের যুগে ধর্মীয় কর্ম, আচার বা উৎসব হিসেবে প্রচলিত, পরিচিত বা আচরিত ছিল না, পরবর্তী যুগে মুসলিম সমাজে ধর্মীয় কর্ম হিসেবে প্রচলিত হয়েছে সে সকল কাজ কখনো পরবর্তী যুগের মুসলিমদের জন্য আল্লাহর নৈকট্য লাভের মাধ্যম হতে পারে না।

যেহেতু মিশরের শাসকগণ ও পরবর্তীকালে আবু সাঈদ কূকবুরী প্রবর্তিত ঈদে মীলাদুন্নবী জাতীয় কোনো অনুষ্ঠান রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে, সাহাবী, তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীদের যুগে প্রচলিত বা পরিচিত ছিল না তাই স্বভাবতই তা বিদ‘আত ও পরিত্যাজ্য। সাহাবীগণ, তাবেয়ীগণ তাদের প্রচণ্ডতম নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভালোবাসা সত্ত্বেও কখনো তাদের আনন্দ এভাবে উৎসব বা উদযাপনের মাধ্যমে প্রকাশ করেন নি, কাজেই পরবর্তী যুগের মুসলিমদের জন্যও তা শরীয়তসঙ্গত হবে না। পরবর্তী যুগের মুসলিমদের উচিৎ প্রথম যুগের মুসলিমদের ন্যায় সার্বক্ষণিক সুন্নত পালন, সীরাত আলোচনা, দরুদ ও সালাম এবং আন্তরিক ভালোবাসার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা জানানো। অমুসলিমদের অনুকরণে জন্মদিন পালনের মাধ্যমে রাসূলের ভালোবাসা প্রকাশ পায় না। বরং এ সকল অনুষ্ঠানের প্রসার সাহাবীদের ভালোবাসা, ভক্তি ও আনন্দ প্রকাশের

পদ্ধতিকে হেয় প্রতিপন্ন করার মানসিকতা সৃষ্টি করে, কারণ যারা এ সকল অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক ভালবাসা ও আনন্দ প্রকাশ করবেন, তাদের মনে হতে থাকবে যে সাহাবীদের মত নীরব, অনানুষ্ঠানিক, সার্বক্ষণিক ভালোবাসা ও ভক্তি প্রকাশ পদ্ধতির চেয়ে তাদের পদ্ধতিটাই উত্তম, যা নিঃসন্দেহে ভ্রষ্টতা। এ ব্যাপারে বহু আলেম সাবধান করে গেছেন। যেমন, সপ্তম-অষ্টম হিজরী শতাব্দীর অন্যতম আলেম ইমাম আল্লামা তাজুদ্দীন উমার ইবন আলী আল-ফাকেহানী (মৃত্যু ৭৩৪ হিজরী/১৩৩৪ খ্রি.), আল্লামা আবু আব্দুল্লাহ মুহম্মাদ ইবন মুহম্মাদ ইবনুল হাজ্জ (৭৩৭ হি./১৩৩৬ খ্রি.), ৮ম হিজরী শতকের প্রখ্যাত আলেম আবু ইসহাক ইব্রাহীম ইবন মূসা ইবন মুহাম্মাদ আশ-শাতিবী (মৃত্যু ৭৯০ হি.) ও অন্যান্য উলামায়ে কেরাম।[৭০]

আমরা আগেই বলেছি যে, জন্মদিন পালনের ন্যায় মৃত্যুদিন পালনও অনারব সংস্কৃতির অংশ, যা পরবর্তী সময়ে মুসলিম সমাজেও প্রচলিত হয়ে যায়। রবিউল আউয়াল মাস যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্ম মাস, তেমনি তার মৃত্যুর মাসও বটে। তাই এটি দুঃখের কারণ হতে পারে। কোনো কোনো বর্ণনা থেকে দেখা যায় যে, ৭ম হিজরী শতাব্দীর শেষে এবং ৮ম হিজরী শতকের প্রথমাংশেও মীলাদুন্নবী পালন অনেক দেশের মুসলিমদের কাছে অজানা ছিল, তারা জন্মদিন পালন না করে মৃত্যু দিবস পালন করতেন। বস্তুত এ সবই গর্হিত বিদ‘আত। ইসলামে

৭০. বিস্তারিত দেখুন: আশ-শাতেবী, আবু ইসহাক ইবরাহীম, আল-ই‘তিসাম (সৌদী আরব, আল-খুবার: দারু ইবন আফফান, ৪র্থ সংস্করণ, ১৯৯৫খ্রি.) ২/৫৪৮; আস সালেহী, আস-সীরাতুশ শামিয়্যাহ, প্রাগুক্ত (১/৩৬২-৩৭৪)।

বিদ‘আতের কোনো স্থান নেই। তাই জন্মদিবস বা মৃত্যুদিবস এসব পালন থেকে আমাদেরকে দূরে থাকতে হবে।

আল্লাহই আমাদের সহায় হোন ও তাওফীক দিন। দো‘আ করি তিনি দয়া করে আমার এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল করেন। আল্লাহর মহান রাসূল, হাবীব ও খলীল মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর অগণিত সালাত ও সালাম। আল্লাহুম্মা সাল্লি ‘আলাইহি ওয়া সাল্লিম মা যাকারুয যাকিরুন ওয়া গাফালা আন যিকরিহিল গাফিলূন।

সমাপ্ত